পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(শ্রমবিভাগ ও কুলমর্য্যাদা।)

খিসা—কারবারী—ওঝা—এবং রায়তগণ।

রিজ্‌লী মহোদয় বলিয়াছেন *,—"Among the chakmas, as perhaps among the Greeks and Romans in the beginning of their history, the sect is the unit of the tribal organization for certain public purposes." অর্থাৎ—"সম্ভবতঃ গ্রীক ও রোমাণদিগেরই মত চাক্‌মাদের বংশ কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্যে জাতীয় শৃঙ্খলাবিধানের (পক্ষে) একক হয়।" কিন্তু বলিতে কি, সম্প্রদায় বিশেষে শ্রমবিভাগের কঠোর ব্যবস্থা হিন্দু-সমাজ ভিন্ন আর কোথায়ও নাই। ইহাতে সমাজের ইষ্টানিষ্ট উভয়ই আছে। একদিকে শ্রমবিভাগে যেমন এক একটি কার্য্যের ভার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর উপর ন্যস্ত থাকায়, তাহাদের বংশধরগণ অতি অল্প আয়াসেই তত্তৎ ব্যবসায়ে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতে পারে, পক্ষান্তরে আবার উপযুক্ত প্রতিযোগিতার অভাবে উন্নতির পথে তেমন অগ্রসর হইবার শক্তি পায়না; এবং বিভিন্নশ্রেণীতে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে সমাজে কোনও নূতন তেজ প্রবেশেরও সুবিধা নাই। বোধহয়, ভারতের প্রাচীন রত্নগুলি হারাইবার ইহাও একটি বিশেষ কারণ। শক্তি না পাইলে কি দিয়া তাহা রক্ষা করিবে? পাশ্চাত্য নীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ এতাদৃশী ব্যবস্থার প্রতি তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। যে দেশে একই জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এ হেন বিপ্রকর্ষণ রহিয়াছে, সেখানে আর জাতীয় একতার সম্ভাবনা কোথায়? বস্তুতঃ হিন্দুদের ভিতর কতকগুলি নিয়ম এমনি কঠোর যে, তাহার বিষময় ফলে সাধারণকে সততই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। কোন রকমে তৎপ্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন

* Tribes and Castes of Bengal, Page—170.

শ্রমবিভাগ।

করিলে সমাজে "পতিত" থাকিতে হয়। ব্যবসায় লইয়া এরূপে জাতীয় উচ্চতা পরিমিত হয় বলিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থও বজায় থাকে। সেই সুযোগে তাহারা একমত হইয়া অবাধ-অত্যাচার করিবারও প্রয়াস পায়। আর তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা পাইলে অমনি বাত-ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ভীষণাকার ধারণ করিয়া "ধর্ম্মঘট" করিয়া বসে। সুতরাং সমস্ত নির্য্যাতন সাধারণকে নীরবে সহ্য করিয়া লইতে হয়। "স্বদেশী-আন্দোলনে"র ফলে অনেকেই সাম্প্রদায়িক তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বপ্রতিভানুরূপ কর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছে; তাহাতে যে সমাজের একটি মহৎলাভ ঘটিবে, সন্দেহ নাই।

চাক্‌মাদিগের মধ্যেও শ্রমবিভাগে কতেকটা শ্রেণীবিভাগ আছে, কিন্তু তাহা বংশগত নহে—কার্য্যগত মাত্র! 'খিসা', 'কারবারী', 'ওঝা', 'রায়ত' প্রভৃতি আখ্যাগুলি তাহাদের কার্য্য লইয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'খিসা', 'কারবারী' গ্রামের সকলেরই নির্ব্বাচন-মতে নিযুক্ত হয়। আবার সকলের সমবেত মত হইলে তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতেও পারা যায়। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে অভিজ্ঞ হইলেই 'ওঝা'র ব্যবসায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যোগ্যতা না থাকিলে উত্তরাধিকার সূত্রে এই সকল কাজ চালাইবার অধিকার পাওয়া যায় না। পরন্তু ইহারা কখনও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনাদৃত বা অস্পৃশ্য নহে! এমন কি, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ পর্য্যন্ত চলিতে কোন বাধা নাই। 'দেওয়ান' ইচ্ছা করিলেই 'খিসা', 'কারবারী' বা 'রায়ত' কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন; এরূপ আদান-প্রদান সমাজে যথেষ্ট চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন নিমন্ত্রণাদিতে সকলে একত্রেই বসিয়া খায়। কিন্তু বসিবার বিশেষ শৃঙ্খলা থাকে। রাজপরিবারের আসন সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট হয়, অনন্তর 'দেওয়ান', 'তালুকদার', 'খিসা', 'কারবারী', 'ওঝা' ও 'রায়ত' ক্রমে বসিয়া যায়। আবার ইহাতেও কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে। তালুকদার "কুটুম্বে বড় হইলে" অর্থাৎ যদি কোনও তালুকদার সম্পর্কে দেওয়ানের পূজনীয় হয়, তবে সেই তালুকদারের স্থান পূর্ব্বে হইবে।

কুলমর্য্যাদা।

খিসা।—খিসাগণ দেওয়ান-তালুকদার অর্থাৎ হেড্‌ম্যানদিগের প্রধান সহকারী; সমাজ শাসনে বা খাজানা উশুল-তহশীলে ইহারা বিশেষ সাহায্য করে। এই নিমিত্ত তাহারা হেড্‌ম্যানগণের আহ্বান মতে উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের কি রাজাবাহাদুরের বাড়ীতে কর্ম্মাধ্যক্ষতা করিতেও ইহারা সুযোগ পায়। বড় বড় ব্যাপারে ইহাদিগের হাতে প্রধানতঃ ভাণ্ডার ঘরের ভার পড়ে; তদ্ভিন্ন

লোক খাওয়ান, অভ্যর্থনা করা প্রভৃতি নানা দিকেই তাহাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বলা বাহুল্য, সমাজে অপর সাধারণের ক্রিয়াকর্ম্মে ইহাদের উপর প্রধান প্রধান কার্য্যের অধ্যক্ষতা থাকে, ইহারাও তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। খিসা-গণকে জুমকর দিতে হয় না, চাষের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে বিনা করে জায়গীর পায়। তবে কিনা ইহাদিগকে রাজপুণ্যাহ এবং রাজার বা হেড্‌ম্যানগণের শুভানুষ্ঠানে এক 'চুঙা' (১) মদ, একটি হৃষ্টপুষ্ট মোরগ ও একটি "আকচলী" (২) দিতে হয়। এই 'খিসা' আখ্যাটী মঘদিগের হইতেই অনুকৃত হইয়াছে।

কারবারী।—কারবারী 'আদমের' শান্তিরক্ষক। দেশের চৌকীদারদিগের ন্যায় ইহারা গ্রামে কোন গোলযোগ ঘটিলে হেড্‌ম্যানের গোচরীভূত করে, সামান্য অভিযোগে হেড্‌ম্যানেরা কারবারীর উপরই মীমাংসার ভার দিয়া থাকেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনাস্থলে ইহাদিগকে নিশ্চয় উপস্থিত থাকিতে হয়। প্রয়োজন হইলে খিসাগণও ইহাদের সাহায্য পায়। অধিকন্তু হেড্‌ম্যানের বাড়ীতে কারবারীর প্রভুত্বও কম নহে; অনেকে কারবারীর উপরই সংসারের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহারা কায়মনে মনিবের হিত সাধনে তৎপর রহে। কারবারীগণও জুমকর হইতে মুক্ত এবং জায়গীর ভোগ করিতে পায়। এতদ্ভিন্ন আর কোন পারিশ্রমিক নাই! তাই গ্রামবাসিগণকেও চৌকিদারী কর দিতে হয় না।

ওঝা।—এই আখ্যাটি প্রাচীন বাঙ্গালাতেও পাওয়া যায়। অমর কবি কৃত্তিবাসও আপনাকে "মুরারি ওঝার নাতি" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রাদি অবধৌতিক চিকিৎসা দ্বারা ভূত প্রেতের দৃষ্টি নিবারককেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু চাকমাদের "ওঝা" ঠিক তাহা নহে। ইহাদিগের "ওঝা" দুই জাতীয়—স্ত্রী-ওঝা ও পুরুষ ওঝা। যে সকল স্ত্রীলোক ধাত্রীর কাজ করে, তাহাদিগকেও "ওঝা" বলে। সামাজিক অনেক কার্য্য পুরুষ-ওঝাগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়; বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলে ওঝার কাজ করিতে পারে না। ভূত-প্রেতাদির উৎপাত নিবারণ, রোগপ্রতিকার, গ্রামদেবতা পূজা প্রভৃতি

(১) চুঙা—বাঁশের এক পর্ব্ব পরিমিত অংশ মাত্র। ইহার এক প্রান্তে গাঁট এবং অপর প্রান্ত খোলা থাকে।

(২) আকচলী—কাঁচা এক আড়ি অর্থাৎ ষোল সের বা পাকা চৌদ্দ সের চাউল পরিপূর্ণ বাঁশের চ্যাঁচাড়ী নির্ম্মিত চুপড়ী বিশেষ।

বহুবিধ ক্রিয়াকর্ম্মে ইহাদের প্রয়োজন। এক কথায়—ওঝাগণ সমাজের যাজক (১)। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিন একচুঙা মদ, পাঁচগণ্ডা পান ও পাঁচটি সুপারি লইয়া গৃহস্থ ওঝাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। অনন্তর ওঝা রাত্রিতে খাওয়ার পর অতি পবিত্রভাবে ভগবানকে স্মরণ করিয়া গৃহস্থের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করে; এবং স্বপ্নে ভাবী অনুষ্ঠানের ফলাফল জানিতে পারে। পরদিন গিয়া যথাবিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ওঝারা এই যজন-পূজনের নিমিত্ত যথোচিত দক্ষিণা পায়। মাত্র কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ব্রতে তাহারা কিছু গ্রহণ করে না। স্ত্রী-ওঝাগণেরও পারিতোষিকের বিধান আছে; আর্থিক পুরস্কারের সহিত মদ এবং কাপড়ও দেওয়া হয়। বিদেশিনী হইলে একটি মোরগও প্রদান করে, আর যদি স্বদেশীয়া হয়, সেই মোরগ কাটিয়া পরিপাটিরূপে ভোজন করায়। কিন্তু ওঝাদিগের খাজানা বাদ নাই। কোন কোন স্থলে হেড্‌ম্যান ইহাদিগকে কর হইতে মুক্তি দিয়া নিজে তাহা বহন করিয়া থাকেন। এস্থলে একটু উল্লেখ থাকা উচিত, চাক্‌মাসমাজে "বৈদ্য" আখ্যাও আছে। ইহারা মুষ্টিযোগ মাত্র সম্বল লইয়া এবং স্থলবিশেষ কবচ-মন্ত্রাদি দৈবানুষ্ঠান বিধানে চিকিৎসা চালাইয়া থাকে।

রায়ত।—সাধারণ প্রজামাত্রকেই রায়ত বলা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাদের পরিবারপ্রতি জুমকর বার্ষিক চারিটাকা, ও একজনের চারিদিন "বেগার"—নতুবা আরও একটাকা খাজানা অধিক দিতে হয়। পূর্ব্বকালে রায়তেরা দেওয়ানের বাড়ীতে পনরদিন "বেগার" দিতে বাধ্য ছিল। এখন তাহা চারিদিনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারও কোন নিয়ম নাই। কোনও কার্য্যে একবার যাওয়া-আসা করিলেই চলে। সম্প্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কেবল চাষী রায়তগণকে বেগার দিতে হইবে না।

এতদ্ভিন্ন চাক্‌মাসমাজে কুম্ভকার, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি কোন ব্যবসায়ীবিশেষ নাই; এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণের আগমনের পূর্ব্বে ইহারা বাঁশে করিয়া পাক এবং লাউয়ের খোলে জল বহন করিত। অদ্যাপি কুকি প্রভৃতি আদিম অধিবাসিবর্গ অনেকেই এইরূপে সংসার চালাইয়া থাকে। চাক্‌মাদিগের মধ্যে মৃত্তিকা পাত্রের বহুল প্রচলন হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা তজ্জন্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের মুখের দিকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। মূল্যও চট্টগ্রাম হইতে রাঙামাটি আসিয়াই চারিগুণ

শিল্পিশ্রম।

(১) ত্রিপুরাদিগের জাতীয় পুরোহিতগণ "ওঝাই" নামে পরিচিত।

হয়—দূরবর্ত্তী স্থানেত আরও বেশী। সেইরূপ গহনা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় লৌহাস্ত্রাদির জন্যও তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিজাতীয় শিল্পীদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়! নিজেদের মধ্যে ইহা যোগাইবার ব্যবস্থা না থাকাতেই এত দুর্গতি! কিন্তু এখনও তাহারা ইহা শিখিতে মনোযোগ দিতেছে না। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে অত্রত্য রাঙামাটি গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের তদানীন্তন হেড্‌মাষ্টার বর্ত্তমানে পেন্সন প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহোদয় এই স্কুলের শাখাস্বরূপে গভর্ণমেণ্ট-ব্যয়ে কুম্ভকার, কর্ম্মকার ও সূত্রধর নিযুক্ত করিয়া একটি শিল্পবিদ্যালয় (Arti-an School) খুলিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের ঔদাসিন্যে অচিরে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। হায়! তাহা এতদিন জীবিত থাকিলে কত শুভফল প্রদান করিত। জাতীয় নেতৃবর্গের এই ত্রুটীর নিমিত্ত আরও বহুকাল যাবৎ সমাজকে কষ্ট পাইতে হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি, ইহাদের শ্মশ্রু নাই বলিলেই হয়; যে দু'একখানি উঠে তাহাও চিম্‌টার সাহায্যে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। সুতরাং আর প্রায়ই ফেলিতে হয়—কেবল চুল। ইতিপূর্ব্বে ইহারা একে অপরের চুল কাটিত। এখনও যে সকল স্থানে বাঙ্গালী নাপিতের যাতায়াত নাই, তথায় পরস্পরের সহায়তায় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইহাতে কিছুই নিন্দার বিষয় নাই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া আসিতেছে, কেনই বা দূষণীয় হইবে?

নাপিতের কার্য্য।

সাধারণ চাক্‌মাগণ কাপড়গুলিও নিজে নিজে ধুইয়া লয়; গৃহিণীদের উপর এই কার্য্যের ভার থাকে। নদীপথে গমনকালে প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ঘাটে ঘাটে চাক্‌মারমণীগণ কাপড় পরিষ্কার করিতেছে। ইহারা প্রথমে বৃক্ষলতাদির ক্ষার কাপড়ে উত্তমরূপে মাখিয়া সিদ্ধ করিয়া লয়। অনন্তর ঠাণ্ডা হইলে তাহা ঘাটের কাষ্ঠের উপর রাখিয়া তদুপরি লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে থাকে; এবং মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা দেয়। কাপড়গুলি বিশেষ ভারী বলিয়া দাঁড়াইয়া আছ্‌ড়াইতে পারা যায় না। ছোট ও পাতলা বস্ত্র পরিষ্কার করিতে অবশ্য দাঁড়াইয়াই আছ্‌ড়ায়।

ধোপার কার্য্য।

ইহা ছাড়া সাধারণ পরিবারে অপরাপর গৃহকর্ম্মেও স্ত্রীলোকগণ অনন্যসহায়। পুরুষেরা দ্বিপ্রহরে নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে প্রশান্ত সুখ উপভোগ করিতেছে, আর তাহাদের সহধর্ম্মিণীগণ দা-হস্তে মার্ত্তণ্ডের প্রবল প্রতাপ তুচ্ছ করিয়া অশেষ কষ্টসাধ্য আহরণে নিরত! বহুনোপ-

কাষ্ঠাহরণ।

যোগী কাষ্ঠ সংগৃহীত হইলে, লতাদ্বারা বোঝা করিয়া আর একখানি লতায় তাহা

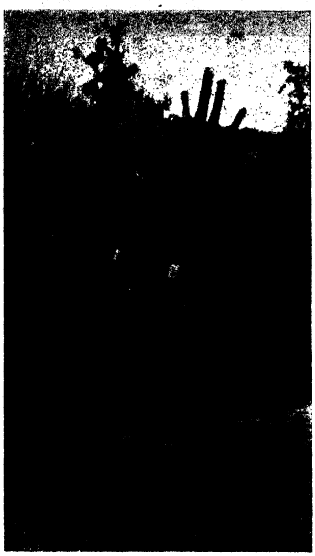

কপালের সাহায্যে পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া সেই কাষ্ঠের বোঝা বহন করিয়া থাকে। কেহ কেহবা কাষ্ঠ সংগ্রহের নিমিত্ত বাড়ী হইতে "থুরুং" (১) লইয়া আসে, তাহা আহৃত কাষ্ঠে পূর্ণ করতঃ উপরি-উক্ত প্রকারে বহন করে। তরি-তরকারী সংগ্রহেও এই একই বিধি। কপালে "থুরুং" ঝুলাইয়া দা-হস্তে "রাণ্যায়" অর্থাৎ পুরাতন জুমে শাক, গুল্ম প্রভৃতি আহরণ করে। এইরূপ কপালের সাহায্যে পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া বোঝাবহন-প্রথা কেবল চাক্‌মাদিগের মধ্যে নহে, পার্ব্বত্য জাতি মাত্রেই ইহা দেখা যায় (২)। চাক্‌মাগণ কথায় বলে,—"কপালের দুখ, কপালেই ভুগুক" অর্থাৎ কপালের দুঃখ কপালেই ভোগ করুক। কথাটী বেশ সদর্থযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী বটে! বস্তুতঃ পাহাড়ে' রাস্তায় বোঝা বহন করিবার পক্ষে ঈদৃশী ব্যবস্থা সুবিধা জনক, সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন স্থানের মুটেগণ যে কোন মোট—এমন কি, লম্বা ও মোটা বাঁশের বোঝা, জলের ভার ইত্যাদি পর্য্যন্ত কাঁধে না লইয়া মাথায় বহিয়া থাকে। ইহাতে যে তাহারা কি সুবিধা পায়, বুঝিতে পারি না!

তরকারী অন্বেষণ।

ইহাদের ধান ভানিবার ব্যবস্থাতেও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। ঢেঁকি আছে

(১) "থুরুং"—বাঁশের চ্যাচাড়ী নির্ম্মিত ঝুড়ি বিশেষ।

(২) ত্রিপুরা রমণীগণকে উক্তরূপে জল আনয়ন করিতেও সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়।

সত্য এবং গঠন প্রণালীও একই রূপ; কিন্তু তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রায় পরিবারেই "ঢেঁকিশাল" নাই। ঢেঁকি মহাশয় বাড়ীর একপাশে অযত্ন-সংরক্ষিত হইয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে! যে সকল পরিবারে গৃহিণীর 'ধা'-আদি কোন দোসর নাই, সেখানে তাহাকে একাই "পাদ-দেওয়া" ও "এলে-ধেওয়া" উভয় কার্য্যই করিতে হয়। কতক্ষণ একটানা "পাদ"দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, বাম হাতে ঢেঁকিটা তুলে' ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে ধানগুলি উল্‌টাইয়া দেয়। এই নিমিত্ত ঢেঁকিটাও প্রায়শঃ হাল্‌কা করা হয়। ঢেঁকি এক হাতে তুলিয়া রাখিতে অসমর্থ হইলে, দুই হাতে উঠাইয়া কোন কাঠ ঠেস্ দিয়া রাখে। ইহাদের মধ্যে "কুলা"র প্রচলন নাই। একমাত্র "চালুনি"তেই উভয়বিধ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

ধান ভানা।

এইত গেল কয়েকটী আনুষঙ্গিক গৃহকর্ম্মের কথা। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয়, চাঁকমামহিলারা লজ্জা-নিবারণের জন্য পরমুখাপেক্ষিণী হয় না। তাহাদের অপূর্ব্ব বয়নশিল্পের কথা যথাস্থানেরূপে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে। এতদতিরিক্ত জুমের কার্য্যেও তাহারা পুরুষের অধিকাংশ সাহায্য করে। বিবাহকালে এইরূপ সাংসারিক কার্য্যদক্ষতা লইয়াই স্ত্রীলোকদিগের যোগ্যতা বিচার হয়। সাধারণতঃ বলে,

মহিলাগণের শ্রমশীলতা।

"নেই মোগত্তুন কাণা মোগ ভালা,
সবাই ন-পে'তে রাজার ঝি ভালা।"

অর্থাৎ 'স্ত্রী না থাকা অপেক্ষা কাণা স্ত্রী ভাল, একেবারে না পাইতে রাজকন্যা ভাল' (১)। ক্ষীরসর পালিতা অকর্ম্মণ্যা রাজ-দুহিতা বিবাহের লোভ এতই সংযত! সাধারণ পরিবারে পুরুষদের খাটুনি অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের খাটুনি অনেক পরিমাণে অধিক। জুমের কার্য্যে পুরুষেরা কেবল জঙ্গল কাটিতে যাহা কিছু কাষ্ঠ পায়, অপরাপর কার্য্য প্রায় প্রধানত স্ত্রীলোকদিগের উপর নির্ভর করে। তদুপরি আবার সন্তান পালন, স্বামীর হুকুম সরবরাহ ইত্যাদি কত আছে! রাত্রিতেও নিয়মিত ঘুমাইতে পায়েনা; অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কাপড়ের জন্য সূতা কাটিতে হয়। বস্তুত তাহারা এত খাটে যে, চিন্তা করিয়া দেখিলে

(১) কথাটি "নাই মামার থেকে কাণা মামা ভাল"—এর অনুরূপ হইলেও তদপেক্ষা গুরুতর চিন্তা-যোগ্য।

আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না! ভগবান যেন তাহাদিগকে শুদ্ধ 'গতর খাটিতেই' পাঠাইয়াছেন, কাপ্তেন লুইনের বর্ণনায়ও আছে *, "পাহাড়ীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যক্ষম ও পরিশ্রমী। স্বভাবত সকল ঋতুতে অবিরত ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম হেতু তাহাদের সমাজে স্ত্রীলোকসংখ্যা হ্রাস পায় এবং অবশিষ্ট জটিল রোগাক্রান্তা হয়।" পুনরায় তিনি পরিশিষ্ট ভাগে যেন অধিকতর বেদনার সুরে লিখিয়াছেন, "ইহাই নিয়ম যে বলবানের প্রতি সকলে সম্মান করে। স্ত্রীলোকেরা শক্তিপ্রকাশে বিমুখ, তাই যাবতীয় বর্ব্বর জাতির মধ্যেই তাহাদের প্রতি ঘৃণা পরিলক্ষিত হয়। হাতের কাছে স্ত্রী, মা কি ভগ্নী থাকিলে অনেকে সামান্য বোঝাটীও লইতে চাহে না।" অহো, তাহাদিগের এই আশ্চর্য্য শ্রমসহিষ্ণুতা চিন্তা করিলে, অন্তরে স্বতই দয়া ও ভক্তির উদয় হয়। একমাত্র দাম্পত্য প্রেমই তাহাদের এতাদৃশ কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার। ধন্য প্রণয়! তোমার আকর্ষণে লোক প্রাণের মমতা তুচ্ছ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে পারে। আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ এই ঘোর বিলাসিতার যুগে চাকমা রমণীদের শ্রম-তৎপরতার কথা অনুধাবন করিবেন কি?

* The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein—P. 36.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[১] জাতীয় চরিত্র, [২] স্ত্রীস্বাধীনতা, এবং [৩] দাম্পত্য প্রেম।

[১]

যে জ্ঞানের আলোকে মানব-হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম বিকাশ পায়, তাহাই প্রকৃত মহান্ ও ভক্তির যোগ্য! নতুবা বিজ্ঞতাভিমানী যে আমরা—নিয়ত স্বার্থের আন্দোলনে মজিয়া থাকি, অজ্ঞতা তদপেক্ষা শত সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। একতা স্বর্গীয় সামগ্রী; ত্যাগ-স্বীকারে অভ্যস্ত না হইলে, এমন দুর্লভ অধিকারে আশা করা যায় না। উচ্চতম রাজশক্তি হইতে নিরন্নের ভিক্ষাপাত্র পর্য্যন্ত একতার শাসনে নিয়ন্ত্রিত। ক্ষুদ্র হইতেই যদি মহতের পরিচয় লইতে হয়, তৃণগুচ্ছ হইতেই যদি একতার শক্তি উপলব্ধি করিতে হয়, তবে চাক্‌মা সমাজ হইতেও আমাদের শিখিবার অনেক আছে! ইহাদের একতাবন্ধন আশাতীত সুদৃঢ়। যে কোন "মেলা" অর্থাৎ অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প মনে হইলে 'আদমের' দশ জন মিলিয়া পূর্ব্বে "তেইংমাং" (পরামর্শ) করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়। তাহা ছাড়া কাহারও কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া তাহার সাহায্য করে। দুর্ভিক্ষের সময় কাহাও অতিরিক্ত ধান বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই, তাহা দীনহীন স্বজনগণের মধ্যে বিতরণ করিতে হয়। বিগত দুর্ভিক্ষের সময় ইহাদিগের যে অসাধারণ ত্যাগস্বীকার দেখিয়াছি, তাহাতে ইহাদিগকে জগতের সর্ব্বোন্নত জীব বলিতে ইচ্ছা করে! প্রতিবেশী ক্ষুধায় মরিতেছে দেখিয়া নিজের যাহা কিছু সঞ্চিত আছে বাহির করিয়া দিয়াছে, অথচ জানিত যে—তাহাকেও অনতিবিলম্বে সেই অভাব ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। ইহাদিগের সেই অলৌকিক উদারতাতেই উক্ত ভীষণ অন্নকষ্ট হইতে নিঃসম্বল অনেকে রক্ষা পাইয়াছিল। হায়, আর্য্যনীতিবেত্তাদিগের বংশধর

একতা।

হইয়াও এই ব্যবহার আজ আমাদের চক্ষে নূতন বোধ হইতেছে! আর একটি কথা পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল, ইহাদের ভিতর পারস্পারিক প্রীতি এত অধিক যে, শিকারলব্ধ পশুর মাংস অকুণ্ঠিত চিত্তে "লুটে" অর্থাৎ আদমবাসী প্রত্যেক পরিবারে বিভাগ করিয়া দেয়। কিন্তু স্বগৃহেই তাহাদের একতা কম, একান্নবর্ত্তী পরিবার সংখ্যা সমগ্র সমাজে বড় অধিক নহে। বিবাহ হইয়া গেলে, ভাই ভাই দূরের কথা, পিতা-পুত্রও ঠাঁই ঠাঁই হইয়া যায়; তবে কোন বিরোধ থাকে না।

সরলতা একতা বন্ধনের শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। সরল না হইলে মন উদার হয় না, সুতরাং অপর প্রাণের সহিত মিলিবার শক্তিই বা কোথা হইতে আসিবে।

সরলতা।

ফলতঃ বলিতে কি, যাঁহাদের হৃদয়-কপাট সরলতার বাতাসে উন্মুক্ত নহে, সংসারে তাহাদের ভাগ্যে সুখভোগ প্রায়ই ঘটিয়া উঠেনা! সরলের "দুঃখিত যে মন, দুঃখের কথা কথা কহে সে অপরে;" কিন্তু কপটাচারী ব্যক্তি তাহা হৃদয়াভ্যন্তরে সুগুপ্ত রাখিতে গিয়া জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলে! তাহারা কি নিজ কি অপর—কাহারও কাছে শান্তিসুখ অন্বেষণ করিয়া পায় না! শিক্ষার অভাব বলিয়া কিনা জানি না, কেবল চাক্‌মাগণ নহে, পার্ব্বত্যজাতিমাত্রেরই সরলতা অসাধারণ! কাপ্তেন লুইনও বলিয়াছেন *, "তাহারা সরল, সৎ এবং প্রফুল্লচিত্ত।" পরন্তু স্থানীয় প্রাচীন অফিসারদিগেরও মুখে শুনিতে পাই,—পূর্ব্বে ইহারা গুরুতর অপরাধ করিয়া আসিয়াও তাঁহাদের নিকট সমুদয় খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ চাহিত; হয়ত তাঁহারাই সেই ঘটনা প্রমাণের নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। কোন মহাত্মা তৎগোপনের মন্ত্র শিক্ষা দিলেও বেচারী জেরার কুটিল চক্রে পড়িয়া খাঁটি কথা আর চাপা দিতে পারিত না। অধুনা শিক্ষা ও বিজাতীয় সংসর্গের ফলে প্রকৃতির এই সরল শিশুদিগের হৃদয়েও কিঞ্চিৎ কলুষভাব প্রবেশ করিয়াছে। তাই বলিতে ইচ্ছা করে, হে শিক্ষা ও সভ্যতা—তোমাদের অনুগ্রহ যদি ইহাই হয়, তবে দূর হইতে প্রণিপাত করি।

* The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein—P. 115

অনিল যেমন অনলের অনুগামী, বিশ্বাস তেমনি সরলতার অনুসরণ করিয়া থাকে। লোকে এসংসারে যাহাতে বিমুগ্ধ, সেই মায়া বিশ্বাসেরই প্রকার ভেদ মাত্র। অতএব সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়,

বিশ্বাস।

জগতের বক্ষ হইতে বিশ্বাস বিলুপ্ত হইলে কি ভয়ানক বিপ্লব ঘটিত! সংসারে বিশ্বাসঘাতকতার পাপ-কোলাহল অবিরত শুনিতে পাওয়া

যায় সত্য, কিন্তু সুখ-দুঃখের তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অদ্যাপি বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ চাকমাদিগকে প্রায়ই বিনা দলিলে নানা জিনিসের জন্য টাকা দাদন দিয়া থাকেন; তাহা ছাড়া ইহাদের অভাব পূরণেও তাঁহারা সাহায্য করেন, কিন্তু বিশ্বস্ততার হানি অতি অল্পই ঘটে!

যাহা সৎ তাহাই সত্য। এই মূল সূত্রে আস্থা না থাকিলে কর্ত্তব্যজ্ঞান আসিবার ভরসা নাই;—সুতরাং সংসারকার্য্য পরিচালনের আর উপায় কোথায়? আমরা স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, অজ্ঞতা সত্যের মর্য্যাদা যেরূপ রক্ষা করিতে জানে, সভ্যতা-দৃপ্ত বিজ্ঞতা সেইদিকে তত মনোযোগী নহে। এ কারণে মনে হয়, "বুঝিবা অজ্ঞতা ছিল ভাল।" সরলতারূপ ভিত্তির উপর সত্যের আসন অবস্থিত। ভিত্তি শূন্যগর্ভ হইলে আসন কখনই স্থির থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চাকমাদিগের জাতীয় জীবনে সরলতার বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইতেছে। যতদিন তাহারা ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে ছিল, পাপ মিথ্যা তখন স্পর্শ করিতেও পারে নাই; কিন্তু ক্রমে আধুনিক সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত যখন দেখিল যে, বিদেশীয়গণ নানা ছলচাতুরীতে তাহাদিগের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেছে, তখন—সত্য বলিতে কি,—তাহারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সুশাণিত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল। এক্ষণে অনেকেই তাহাতে শীঘ্রহস্ত—সুযোগ পাইলেই প্রয়োগে ইতস্ততঃ করে না। হায়, "অভাবেই স্বভাব নষ্ট করে!"

সত্য পরায়ণতা।

দয়া ও দানে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রথমে দয়া পরে দান—প্রথমে কর্ত্তব্যজ্ঞান, পরে কার্য্য। দয়ালু হইয়াও দাতা না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের একটা কৈফিয়ৎ থাকে। তবে যাঁহারা কেবল "বিজ্ঞতা"র মধ্যেই কর্ত্তব্যজ্ঞান নিহিত মনে করেন, তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট বিচারক বলিতে পারি না। এই পার্ব্বত্যদিগের ভিতরে কর্ত্তব্যজ্ঞানের যে উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উন্নত জাতিবিশেষেও তাহার অত্যল্প মাত্র প্রতিপালিত হয়। ইহারা আবশ্যক বুঝিলে আর্য্যসংহিতাকার 'মনু'র উপদেশকেও অতিক্রম করে! এমনও দেখা গিয়াছে, প্রার্থীর অভাব হইতে দাতার অনটন অনেক অধিক, তথাচ তিনি প্রার্থনা পূরণে যত্নবান। এতদ্ভিন্ন ভিক্ষু ও শ্রমণদিগের সেবা, আত্মীয় বা সম্মানাস্পদ ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দান, উৎসর্গাদি প্রায়ই আছে, এবং রোগ প্রতিকার এবং তাদৃশ বিপদ-নিবারণ প্রভৃতির নিমিত্ত দানধর্ম্ম অবশ্য করণীয়। চট্টগ্রামের অনেক আচার্য্য, বৈরাগী এবং নীচ শ্রেণীজ ব্রাহ্মণ

দান।

আসিয়া ইহাদিগ-হইতে (নানা বুজরুকি খেলাইয়া) কত দান-দক্ষিণা আদায় করে ; কিন্তু ইহারা তথাপি তাহাদের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাবান !

আতিথেয়তা।

অতিথিসৎকার ভারতের একটি চিরন্তন ব্যবস্থা ! কপর্দ্দক মাত্র না লইয়াও দেশ-পর্য্যটনের আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব ছিল। বর্ত্তমানে আমরা সেই "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি"র সেবা তেমন গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি না, অথবা সভ্যতার ভাষায় বলিতে গেলে—আতিথেয়তা মুষ্টিভিক্ষার ন্যায় বর্জ্জনীয়। সমাজকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এ দুইকে নির্ব্বাসিত করা প্রয়োজন, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান ধারণা ! বস্তুতঃ অধুনা অতিথির প্রতি সমাজের ঘৃণা-দৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত নিতান্ত কষ্ট ও অসুবিধায় না পড়িলে; কেহই আতিথ্য-গ্রাহী হয় না। পৌরাণিক যুগের শিখিধ্বজ, দাতাকর্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের অতিথিসৎকারের বিস্ময়োদ্দীপক চিত্র সভ্যতার আলোকে মূল্যশূন্য জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু এই পার্ব্বত্যজাতির আতিথেয়তার সহিত তুলনা করিলে, সেই সন্দেহ দূরীভূত হয়। এখনও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, হয়ত কোন গৃহস্থ ২।৪ দিন ধরিয়া অন্নাভাবে প্রায় সপরিবারে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে, এহেন সময়ে অতিথি উপস্থিত। কিন্তু অতিথিকে তখন তাহাদের এই ভীষণ দুরবস্থার সংবাদ কিছুমাত্র বুঝিতে না দিয়া গৃহপতি গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে যে কোনরূপে অতিথি-সৎকারের উপকরণসমূহ যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছে ! আর যাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল, তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, অতিথিকে আতিথ্যজনিত কোন মনোবেদনা অনুভব করিতে হয় না। কেবল পুরুষেরা নহে, তাহাদের সহধর্ম্মিণীরাও এজন্য সবিশেষ তৎপরা থাকে। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"অতিথি সেবায় রত, সতীলক্ষ্মী শ্রমশীলা,
বনাশ্রম আলো করে—যেন শত শকুন্তলা।"

দুঃখ এবং লজ্জার বিষয়, কোন কোন বাঙ্গালী আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়া জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় করিয়াছে। তজ্জন্য অনেকে সাধারণ বাঙ্গালী অতিথিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি সেবায় পরাঙ্মুখ হয় না। পক্ষান্তরে খাওয়ার সময় যে কেহ, এমন কি সন্নিহিত প্রতিবেশীও গৃহে উপস্থিত হইলে না খাইয়া ফিরিতে দেয় না।

স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতা দ্বারা জাতিবিশেষের তেজ ও শক্তি গঠিত হয়।

যে জাতি যত অধিক পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে, তাহাদের ক্ষমতাও তত অধিক। আবহাওয়া—তেজ ও শক্তি গঠনে অতি অল্পমাত্র সহায়তা করে। চাকমাগণ স্বাধীনতা হারাইয়াছে অধিক দিনের কথা নহে; আর তাহাদের আত্মনির্ভরতার পরিচয়, পূর্ব্বপরিচ্ছেদেও কিয়ৎপরিমাণে দেখাইয়া আসিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও তাহারা পরমুখের দিকে তাকাইত না। কিন্তু অধুনা ক্রমে বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রলোভনে আত্মশক্তি হারাইতেছে। এখন যাহা কিছু তেজ অবশিষ্ট, তাহার প্রকৃত নাম আত্মাভিমান, তেজের একটি ক্ষীণ প্রকৃতি-বিশেষ। তেজ মৃদু হইলে তাহা উজ্জ্বল দেখাইবার যে চেষ্টা,—তাহাই আত্মা-ভিমান, ইহাই তাহাদের বর্ত্তমানে অবশেষ! কিন্তু তেজ কমিলেও তাহাদিগের শারীরিক যে শক্তি, তাহা কমে নাই। সভ্যতার 'অগ্নিমান্দ্য' না জন্মিলে মানবের দৈহিক বলের কদাচিৎ ব্যত্যয় ঘটে। বিশেষতঃ সংসার-সংগ্রামের চালনায় তাহাদের শক্তি পরিপুষ্ট হইতে পারে। চাকমাদের অনেককে দেখিলে মনে হয়, বল যেন শরীরে আর ধরিতেছে না। মাংসপেশীগুলি স্থূল ও সুদৃঢ়, তন্মধ্যে শোণিত সঞ্চালন যেন বাহির হইতেই সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইতেছে। পরন্তু চেহারা দেখিয়া ইহাদের বয়স নির্ণয় করা সহজ নহে, তাহাতে বিশেষ বহুদর্শিতা আবশ্যক হয়। কোন কোন ৪০।৪৫ বৎসর বয়সের প্রৌঢ়কেও পূর্ণ যুবকের মত দেখায়। এমন কি, কাহারও ৬০।৬৫ বৎসরেও যুবার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এদেশে বাঙ্গালীদের চুল শিঘ্রই পাকিয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ীদের মধ্যে পলিতকেশ বিরল।

তেজ ও শক্তি।

তেজ ও সংযম প্রায় বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও তেজ সংযমকে সুদৃঢ় করে। কিন্তু কেন জানি না, চাকমাদিগের চরিত্রে সংযমের একান্ত অভাব। অতি সহজে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তাহা ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চন এবং মুখে (ওষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিয়া জোরে বায়ুনির্গমনে) এক অব্যক্ত শব্দদ্বারা সহজে প্রকটিত হয়। স্কুলছাত্রদের মধ্যেও দেখিয়াছি, চাকমাবালকের অনেকে হয়ত অঙ্ক কষিতেছে, কিন্তু প্রথমচেষ্টা বিফল হইতেই "ন পারিম্" বলিয়া ফেলিয়া রাখিল। শুনিয়াছি, শিক্ষার প্রথম বিস্তার কালে শিক্ষক একটু চোক্ রাঙাইলেই তাহারা স্কুল ছাড়িয়া পলায়ন করিত। পল্লিগ্রামে এরূপ ঘটনা অদ্যাপি প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সাধারণ লোকে আসিয়া কাজের সময় ইতস্ততঃ উকিঝুঁকি দেয়। যদি জিজ্ঞাসা করি,—"কি চাও?"

সংযম।

অমনি বিরক্তি সহকারে উত্তর করে, "কি চাইত?" অথচ প্রকারান্তরে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, তাহার কিছু জানিবার বা বলিবার আছে। এইরূপে আরও নানাস্থলে তাহাদিগের ধৈর্য্যবিচ্যুতির উদাহরণ পাওয়া যায়। নূতন আগন্তুকের পক্ষে এই দৃশ্য প্রথম প্রথম অশেষ বিরক্তির কারণ হয়, কিন্তু ক্রমে তাহাদের জাতীয়ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে তখন বিরক্তি যাইয়া অনুগ্রহ আসে। আর যে বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদিগের বর্ত্তমান অবলম্বন, তাহার শাসন মানিয়া চলে—এরূপ লোক সমাজে অতি বিরল। পঞ্চশীলাচারী লোকও একান্ত দুর্লভ। বলিতে কি, তাহারা ইন্দ্রিয় দমনে সাতিশয় দুর্ব্বল।

বোধহয় সংযমেরই অভাবে চাক্‌মাদিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা একেবারেই নাই। নতুবা ইহারা যেরূপ পরিশ্রমী এবং উপার্জ্জনক্ষম, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা ইহাদিগকে অতি সামান্যই আঘাত করে,—তাহারা উপস্থিত সুখ-সম্ভোগে নিতান্ত ব্যগ্র হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাস হইতে জুমের ফসল পাকিতে আরম্ভ করে; তখনকার সামান্য আয়ে কোন রকমে দিন কাটায়। পরে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে ধান কার্পাস পাওয়া গেলে, তাহাদের স্ফূর্ত্তিই বা দেখে কে? নবান্ন-উৎসবে টাকা যেন কড়ির সমানও মূল্যবান নয়! ইহাছাড়া দিবারাত্রি মদের ভাটি, এবং প্রায়শ পিষ্টকাদি চলিয়া থাকে। এইরূপে আমোদ প্রমোদে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত যায়। তখন "মহামুনি" মেলার খরচ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেখানে যে সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, বেহালা, কন্সার্ট প্রভৃতি সখের সামগ্রী ক্রয় করে, সে সমুদয় আর বাড়ী পর্য্যন্ত আসিতে পায় না। নাচের হুজুগে সমস্ত সেখানেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর ক্রমে রিক্তহস্ত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। প্রথম প্রথম প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজন হইতে ধার, সাহায্য এবং ব্যবসায়িগণের দাদন প্রভৃতি দ্বারা অতিকষ্টে চালাইয়া থাকে। পরে যখন চারিদিকে সাহায্যের দ্বার রুদ্ধ হয়, তখন ফলমূল শাকাদি ভক্ষণে বা অর্দ্ধাশনে—অনশনে দিনপাত করিতে বাধ্য হয়। এতাদৃশ কষ্টে পড়িতে হইবে জানিয়াও সৌভাগ্যের সময় তাহাদের ইহা স্মরণ থাকে না (১)। হায়! না জানি ভগবান কবে তাহাদিগের এই মোহ দূর করিবেন।

মিতব্যয়িতা।

(১) 'আষাঢ়ে গল্পে'র ন্যায় এমন ও দু'একজনের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায় যে, সৌভাগ্য-ক্রমে কোনবারে আশাতীত ফসল লাভ করা গেলে—তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। কারণ প্রতি

বিলাসিতা।

বিলাসিতা বর্ত্তমান সভ্যতার এক প্রধান নিদর্শন। তাই আমরা সুসভ্য নামে পরিচিত হইবার আশায় তুচ্ছ ফুকাদানার সহিত মুখের অন্নগ্রাস বিনিময় করি। সঙ্গে সঙ্গে এই সরলপ্রাণ চাকমাগণও অনল-লুব্ধ পতঙ্গপ্রায় এই বাহ্য চাকচিক্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কাপ্তেন লুইন "এ ফ্লাই অন্ দি হুইল" নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন * —"ইউরোপীয় সভ্যতার কলুষিত ভাব প্রবিষ্ট হইতে না দিয়া ইহাদিগকে উন্নত করা আমার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইহা বড়ই কঠিন সমস্যা।" অন্যতঃ তিনি তিনি "পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ" নামক পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে এসম্বন্ধে অধিকতর প্রাণ খুলিয়া লিখিয়াছেন †, "শারীরিক আবশ্যকীয় অভাবের উপরে কিছুরই প্রতি তাহাদের সহানুভূতি নাই। × × × × আমরা দেখি পৃথিবীর অপর সর্ব্বাংশেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবর্ত্তন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অপকার সমূহ আসিয়াছে; তথাপি জগতের সর্ব্বত্র যাবতীয় অনুন্নত জাতির উপরে আমরা প্রথমে (যাতায়াত বা বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা) সম্বন্ধ স্থাপিত করি, এবং পরিশেষে সভ্যতারূপ বিরাট উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ব্যবহারাদি চালাই। × × কিন্তু এই সভ্যতা কি বা দিয়া থাকে? মিঃ লেইং বলেন, × × সত্য বটে, বর্ত্তমানে পূর্ব্বের ন্যায় অধিকাংশলোক উপবাসের পার্শ্বে রহিয়াছে, তবুও ইহা উন্নত স্বাচ্ছন্দ্যের অযোগ্য নহে। আমি কল্পনা করিতে পারি, পাহাড়ীরা বলিবে—'হে প্রভু, তাদৃশী উন্নতি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।' সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্য ধনবৃদ্ধির ইচ্ছা,যাহা কেবল আবশ্যকানুরূপ নহে—জীবনের

* Page—379.

† Poge—115-16

বৎসরই তাহারা অনটনে পড়িয়া মহাজন হইতে ধার করিয়া আসিয়াছে, এবারে তাহার প্রয়োজন হইতেছে না—এ কেমন কথা? তখন তাহারা সেই প্রাপ্ত ধনরাশি বৎসরের প্রথমভাগেই যথেচ্ছ আমোদ-প্রমোদে নিঃশেষিত করে। অনন্তর অতীত প্রথার অনুসরণ করিয়া মহাজনদিগের শরণাপন্ন হয়। পরন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ঘরে চাউল থাকিলে, চৈত্র পর্য্যন্তও চলিবে না জানিয়াও—তিন চারিজনবিশিষ্ট পরিবারে ৩।৪ সের চাউল শাক করিতেছে। তাহা হইতে কিছু তাহারা খায়, অবশিষ্ট মোরগ, শূকরকে ঢালিয়া দিতেছে; ইহা ছাড়া মদের ভাটিও লাগাই আছে। এবং ইহাও শুনিয়াছি যে, বিগত ভীষণ দুর্ভিক্ষকালে যখন সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট চাউল ধার দিতে ছিলেন, অবিমৃষ্যকারী অনেকে তাহা দুদশদিন উপবাসের পর পাইয়াও স্থানীয় দোকানে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করতঃ মদ কিনিয়া খাইয়াছে।

সুখান্ত এবং বিলাসিতাও যেন চলে। × × আমাদের পাহাড়ীদের ন্যায় সরলতাচারীদিগের মধ্যে তেমন কোন অভিপ্রায় নাই; তাহাদের স্থিতিহীন জীবন অত্যধিক সম্পত্তি সঞ্চয় হইতে বারণ করে এবং তাহারা সম্পূর্ণ জাতীয় সমতা ভোগ করে। × × এই সকল সরল জাতির মধ্যে উক্ত সভ্যতা প্রবেশ করিলে তাহাদিগের কোন উন্নতি হইবে না, বরং ধ্বংস করিবে।" বস্তুতঃ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং বাঙ্গালী-সংসর্গই ইহাদিগের "মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের" ভিতর বিলাসিতা আনিয়াছে। অবিবাহিতা বালিকাগণ একমাত্র "পুতি"র লহরী ভিন্ন বিশেষ কোন বিলাসোপকরণ সামগ্রী পায় না। কিন্তু বিবাহের পর স্বামীর সোহাগের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্-বেরঙের সাড়ী, বডি, নানাবিধ গহনা, সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি নানা সখের সামগ্রীও লাভ করে। শিক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ সাক্ষাত বিলাতফেরত বাবু—চলা ফিরাও অনেকটা ইঙ্গবঙ্গদলসম্মত। ইহা ছাড়া, সাধারণ চাক্‌মাদিগের মধ্যেও এতদূর বিলাস-ইচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে যে, কেহ কেহ দোকানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে 'রাজা যে কাপড় পরেন,' তাহা অনুসন্ধান করে। দোকানদারেরাও এই সুযোগে কল্পনাতীত মূল্য আদায় করিয়া লয় (১)।

অনেকে বিলাসিতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে না। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে অপকার ঘটিতে পারে, কিন্তু বিলাসিতা না হইলে কোন ক্ষতি নাই।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা রাখিতে বিশেষ ব্যয়েরও আবশ্যক হয় না, অথচ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। ইহারা এই দিকে কিঞ্চিৎ উদাসীন বটে, কিন্তু আহার্য্য এবং পানীয়ের প্রতি দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, বোধ হয় এইরূপ পৃথিবীর অতি অল্প জাতিরই আছে। প্রতি সপ্তাহে এক বা ততোধিক বার নেকড়া-জলে মঞ্চের উপরিতল পরিষ্কার করিয়া থাকে। কিন্তু তিনটী বিষয়ে ইহাদের অনেকে এখনও সভ্যজাতি হইতে দূরে

(১) এস্থলে আর একটি কথা বলিলে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হয়। বস্ত্রাদি কোন জিনিষ দোকানে অবিক্রীত হইয়া পড়িয়া রহিলে, ব্যবসায়ীরা তাহা নিজে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। অনন্তর যখন সৌখীন চাক্‌মা যুবকগণ জিনিষ ক্রয় করিতে আসে, তাহারা "মহাজনের" ব্যবহৃত দ্রব্যই উৎকৃষ্টতর মনে করিয়া তাহা লইতে অভিলাষী হয়। "মহাজনেরা" প্রথমে তাদৃশ অনুরোধে অস্বীকৃত হইয়া তাহাদের ব্যগ্রতা বর্দ্ধিত করে, অবশেষে অসম্ভব মূল্য আদায় করিয়া তাহা ছাড়িয়া থাকে।

রহিয়াছে। প্রথমতঃ স্নানের প্রয়োজনীয়তা যে কি, বুঝিতে পারে না; শরীর ঠাণ্ডা থাকিলে আর স্নানের আবশ্যকতা অনুভব করে না। এই নিমিত্ত শীতকালে স্নান কদাচিৎ ঘটে। গ্রীষ্মকালে শরীরের গ্লানি দূর করিতে কখন কখন স্নান দুইবারও হয়, কিন্তু ডুব দিয়া নহে। বিশেষতঃ স্ত্রী কি পুরুষ যাহাদের মাথায় চুল আছে, ডুব দিয়া স্নান তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সপ্তাহ বা ততোধিক অন্তর ক্ষার বা লতা-বিশেষের নির্যাস দ্বারা চুল ধোওয়াই প্রশস্ত বিধি। স্নানান্তে বস্ত্রপরিবর্ত্তন প্রায়ই ঘটে না। স্বেদসিক্ত পরিধেয় যখন দুর্গন্ধে ব্যবহারের অযোগ্য হয়, তখন একবার কাচিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের মঞ্চোপরিভাগ সুপরিষ্কৃত ও মনোহর। বাহির হইতে কেহ আসিলে প্রথমে "ইন্দরে" উঠিয়াই পা ধুইবার ব্যবস্থা আছে, এই নিমিত্ত "সাঁকো"র ধারে এক কলসী জল এবং একটি জলপাত্র রাখা হয়। পরন্তু মঞ্চের নিম্নতল নরক বিশেষ। উপরিতল হইতে নানা ময়লা পরিত্যক্ত হইয়া আস্তাকুঁড় হইতেও জঘন্য করিয়া তুলে। রাত্রিতে বালক এবং অসমর্থেরা মঞ্চোপরি হইতেই মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করে। অবশ্য বাড়ীতে শূকর থাকাতে তাহা অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। কিন্তু শূকর ও মোরগেরা নিজে যাহা করে, তাহা নিতান্ত অমার্জ্জনীয়। তৃতীয়ত ইহাদের বাহ্যের পর শৌচব্যবস্থা অন্যবিধ। মল ত্যাগের পর 'চ্যাচাড়ী' কিম্বা 'বাখারী' দ্বারা মুছিয়া ফেলে; চলিত কথায় ইহার নাম—"খক্ করন।" উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে জলাভাব বশতঃই ঈদৃশ বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে। অবশ্য চাক্‌মাদিগের উচ্চশ্রেণীতে এই সকল কদর্য্য ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই। মধ্যম শ্রেণীও প্রায় সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অধমশ্রেণীরই খাঁটি চিত্র। যাহা হউক, ইহাদের পরিচ্ছন্নতার আর একটি সুন্দর বর্ণনা এস্থলে দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বর্ষাকালে পথ ঘাট কর্দ্দমময় হইলে, কেহ কেহ বংশপাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা সাধারণত বাজীকরদিগের নিকট দেখা যায়। ৬।৮ হাত পরিমিত দুইটী বাঁশে সমান উচ্চতায় পদস্থাপনের উপযোগী সুবিধা করিয়া লয়। তদুপরি চড়িয়া ইচ্ছামত যাতায়াত করিয়া থাকে।

[২]

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

বর্ত্তমানে স্ত্রীস্বাধীনতা অনেকেরই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে তাহার উপযোগিতা স্বীকার করিতেছেন। এই সংস্কারকেরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শে—দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সময়ে সময়ে উভয় দলে ভীষণ বাদপ্রতিবাদ

লাগিয়া যায়, কিন্তু এযাবৎ তাহার "ছাইভস্ম" কিছুই মীমাংসা হয় নাই। তবে এইমাত্র বুঝা যায়, ইহারা যে স্বাধীনতা লইয়া চিন্তিত, তাহা পর্দাতঙ্কা মাত্র! পুরুষেরা স্বচ্ছন্দমনে সর্ব্বত্র বেড়ায়, অর্দ্ধাঙ্গের অধিকারিণী হইয়া স্ত্রীলোকেরা কেন পারিবে না,—ইহাই সর্ব্বোচ্চ ভাবনার বিষয়! ইউরোপ এই নিমিত্ত বড়ই উদার; আর রক্ষণশীল মুসলমানদিগের সংসর্গে পড়িয়া হিন্দুগণ সেই মহত্ত্ব হারাইয়াছে (১)। যাহা হউক, চাক্‌মাগণ যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাহাতে কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব আছে। তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। কবির ভাষায়—

"স্বাধীন সর্ব্বত্র গতি, অথচ সংযত"।

মাথায় "হেটের" বদলে পাগড়ি (খবং) প্রচলিত হইয়াছে, তা'ছাড়া কোথাও যাইতে হইলে, সেই 'খবং' এরই উপর আর একখানি কাপড়ে মস্তক মাত্র ঢাকিয়া অবগুণ্ঠনের মর্য্যাদা রক্ষা করে। পরন্তু ইহাদের গৃহকর্ত্রীরা অভ্যর্থনা-শালায় গৌরব বৃদ্ধি করিবার সুবিধা পায় না বটে, কিন্তু স্বজাতির নিকট বাহির হইতে কোন আপত্তি নাই। নিতান্ত আবশ্যক না ঘটিলে পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ঘটে না সত্য, অথচ অনূঢ় ও অনূঢ়ার আলাপে, মিলনে বা ভ্রমণে কোন বাধা নাই। এক কথায়—স্বজাতীয় সকলেই যেন এক পরিবারের ন্যায়, বিজাতির সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক সম্বন্ধ। পাহাড়ীদের কোন কোন জাতীয় স্ত্রীলোকেরা বাজারেও যায়, কিন্তু ইহাদের সচরাচর তাহা নাই। তবে "মহামুনি" প্রভৃতি মেলাতে স্ত্রীলোকেরাও যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ পরিবারে আরও অনেক সময়ে মহিলাগণকে গৃহের বাহিরে কাজ করিতে হয়; রাজপথে যাতায়াতও বিরল নহে। একন কি, একাকিনী নৌকা চালাইয়া যাইতেও দেখা যায়।

(১) কাপ্তেন লুইন এজন্য আমাদিগকে ঠাট্টা করিয়া ইহাদের কথায় লিখিয়াছেন,—"The position of the women among them is preferable, in my opinion, to that occupied by the females of Hindoostan. Here is no mock modesty, but nature, pure and simple; the custom of concealing their women and hiding their faces, conveying as it does how much mistrust of man to man exists only among the more effeminate races of Asia. Here, if a women is condemned for her physical weakness, and forced, moreover, to bear the heaviest share of the toil for bread, she is still honoured as a wife and mother, trusted in her in-comings and out-goings. and her words of advice listened to with respect." (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein—p. 117.)

অধুনা বঙ্গীয় পরিবারের অনুকরণে সম্ভ্রান্ত মহলে অবরোধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ্যে রাজ-অনুমোদন ব্যতিরেকে আব্রুরক্ষার সাধ পূর্ণ করিতে পারে না। আশা করি সরলা অবলাগণকে অন্তঃপুর-কারাগারে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ দিতে রাজা বাহাদুর বিশেষরূপ বিবেচনা করিবেন।

[৩]

স্ত্রী, চাকমাদিগের সর্ব্বপ্রধান সহকারিণী। তাহাদের সম্বন্ধ কেবল শয্যা লইয়া নহে, স্বামীর সংসার পালনে তাহারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া অহর্নিশ খাটিয়া থাকে(১)। এক মাত্র বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেমই এই কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের অনাবিল শান্তি নির্ঝর! পবিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যুবক-যুবতীর অতি সহজেই হৃদয় বিনিময় হইয়া যায়। বিবাহের বৎসর পরস্পরের পাশছাড়া হওয়াও সামাজিক বিধি-নিষিদ্ধ। পক্ষীদম্পতির ন্যায় তাহারা যথাসম্ভব সতত একত্র থাকিতে প্রয়াস পায়। কবিবর নবীনচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন :—

দাম্পত্য প্রেম।

"পতি পত্নী একচিত্ত, একই জীবন ; উভয় জীবন-স্রোত বিবাহ অবধি,
গঙ্গা যমুনার মত, এক অঙ্গে পরিণত,
একই বিমল স্রোতে বহে নিরবধি।" (জুমিয়া জীবন—১৭শ শ্লোক।)

পরন্তু কবি স্বীয় বর্ণনায় স্বয়ং সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, উপসংহারে সেই স্বর্গীয় সম্পদে আত্মহারাভাবে গাইয়াছেন,—

"ইচ্ছা হয়, হায়! ওই জুমিয়ার সনে, বিনিময় করি এই বাঙ্গালী-জীবন ;
শু'য়ে ওই ধরাতলে, লয়ে প্রিয়া বক্ষস্থলে,
লভি স্বর্গ সুখ,—ওই জুমিয়া জীবন।"

জুমিয়া-জীবনের প্রেম-রাজ্যকল্পনায় আজ কবির ভৌতিক দেহ ধরার অঙ্কে বিলুপ্ত বটে, কিন্তু তদীয় অমর আত্মা স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত!

---

(১) পরন্তু তাহাদিগের এই শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী লুইন (The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, P.—116.) লিখিয়াছেন, "In marriage with us a perfact world springs up at the word of tenderness, of fellowship, trust, and self devotion. With them it is a mere animal and convenient connection for procreating their species and getting their dinner cooked." ইহা পড়িয়া মনে হয়, তিনি এই পার্ব্বত্য জীবন সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[১] ধর্ম্ম ও [২] পর্ব্বনিয়মাদি।

[১]

চাকমাদিগের ধর্ম্মজীবন এ যাবৎ নিরঙ্কুশ, সুতরাং বিশৃঙ্খল! সংজ্ঞা ধরিয়া বস্তুর পরিচয় নির্দ্দেশ করিতে হইলে, ইহাদের ধর্ম্মবিচারে নানা সমস্যা আসিয়া পড়ে। বায়ইয়ারী পূজায় গ্রামবাসীর অনেককেই অল্পবিস্তর কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখা যায়, দূর হইতে কাহাকেই বা অধ্যক্ষ মনে করিব? তাই অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহারা মিশ্র-ধর্ম্মাবলম্বী। বস্তুতঃ ধর্ম্মবিপ্লবে ভারতের ইতিহাস কলঙ্কিত! তাহারই আনুষঙ্গিক ফলে নানা শাখাধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং মূলধর্ম্মনিচয়েও ন্যূনাধিক পরিমাণে পরস্পরের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। তাই কার্য্যতঃ চাকমাগণ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান ধর্ম্মত্রয়ের অধিকারপীড়িত হইলেও, ইহারা একতম প্রধানধর্ম্মের অধীন।

ধর্ম্মসমস্যা।

রাজা ধর্ম্মের সংরক্ষক। কোন কোন সমাজে তৎপরিচালনভারও রাজহস্তে থাকে। রাজ-প্রদর্শিত পথে সমাজের সকলকেই অনুসরণ করিতে হয়। বস্তুত! রাজা—চাকমা জাতির সর্ব্বোচ্চ অধিনায়ক। তিনি যখন যেই ধর্ম্ম নীতি অবলম্বন করেন, সাধারণে বিচার-বিতর্ক ব্যতিরেকে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। "চাটিগাঁ ছাড়া"তেই দেখিয়াছেন, 'যুবরাজ বিজয়গিরি পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসনাধিরোহণ সংবাদ পাইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে বিরত হন এবং সৈন্যগণ সহ বিজিত ব্রহ্মদেশ হইতে পত্নী গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ক্রমে তাহাদের ধর্ম্ম ও আচারপদ্ধতিগুলিও পরিগৃহীত হইয়া যায়।' সুতরাং ব্রহ্মদেশবাস হইতেই ইহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মিঃ বুচানন (Mr. Buchanan)ও

রাজার নেতৃত্ব।

বার্ম্মিজ্‌দিগের ধর্ম্ম এবং ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাদিগের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১)। কিন্তু ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বে ইহারা কোন্ ধর্ম্মের আশ্রয়ে ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ! মাননীয় শ্রীযুক্ত রিজ্‌লী মহোদয় ইহাদিগের "সংবাসা" (অর্থাৎ বৃক্ষ স্রোতাদির) পূজা দেখিয়া অনুমান করেন যে (২), বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ইহারা জড়োপাসক ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার এবম্বিধ সিদ্ধান্তের উপর আমরা তত আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। কেননা প্রায় সমুদয় প্রাচীন ধর্ম্মেরই আদিম বিবরণে তাদৃশী জড়োপাসনার গন্ধ পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, "চাটিগাঁ ছাড়া"র ইহাদিগের আদিম ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সেনাপতি রাধামোহন চম্পকনগরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা সমরগিরি সমীপে বিজিত রাজ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"(ছাজের গাভুরে বকাদি)
ছিদুগা মানুশ্যুন অজাদি।"

সেখানকার লোকগুলি বিজাতি বা নীচজাতি।

"(চুঙা কাদিস্যাই পানিখ্যোই)
ছিদুগা মান্‌জাত্তুন পৈদা নেই।"

সেখানকার লোকের নিকট পৈতা অর্থাৎ উপবীত নাই।

"(দুধে খাদি ছিজেদং)
পৈদা বারাৎ গরিস্যাই আমি ছিদু বেরেদং।"

আমরা সেখানে পৈতা কাঁধে লইয়া বেড়াইতাম।

এতদ্বারা আমরা চাক্‌মাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ব্রহ্মবাসীদের হইতে বর্ণোৎকৃষ্ট এবং উপবীতধারী বলিয়া জানিতে পারি। বর্ত্তমানে প্রবল বৌদ্ধাধিকারেও ইহারা ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে যজ্ঞসূত্রের অনুকরণে উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আরও একটি কথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, "জাদি পূজায় ঘি দিবি।" অর্থ—"ধর্ম্মকামে" ঘৃত দিবে অর্থাৎ যজ্ঞ করিবে।

ক্ষত্রিয়ত্ব।

সুতরাং তাহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বীকৃতব্যও বটে। আবার কতিপয় স্বার্থান্ধ বর্ণনাকারের অনুগ্রহে ভারতের নানাস্থানে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি

(১) Asiatic Researches Vol. vi. P. 229.

(২) Tribes and castes of Bengal, P.—172.

হইয়াছে। তাঁহাদের কল্পনায় পশ্চিম ভারতে যেইরূপ সূর্য্যবংশের বাহুল্য, পূর্ব্বভারতে— বঙ্গদেশ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে সেইরূপ চন্দ্রবংশের ছড়াছড়ি হইয়াছে। বাঙ্গালায় সেনবংশ, উড়িষ্যার কেশরী বংশ, শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং ত্রিপুরার রাজবংশ ও চট্টগ্রামাধিপতি দামোদর প্রভৃতি সকলেই চন্দ্রবংশজ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান আলোচ্য প্রসঙ্গে ত্রিপুরার "রাজমালা" লেখক স্পষ্টতই লিখিয়াছেন*,—"মিতাই অর্থাৎ মণিপুর রাজবংশ সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে প্রবেশলাভ করতঃ শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদিগের কৃপায় অর্জ্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা মঘ নরপতিগণ অল্পকাল মধ্যে চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কৃপায় চন্দ্রবংশজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।"

* ১৩শ পৃষ্ঠা।

বস্তুতঃ ত্রিপুরা এবং চাক্‌মাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী তুল্যরূপ বিবেচিত হয়। তাহাদের বাসস্থান—নামতঃ চম্পকনগর এবং ত্রিপুরারাজ্য পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী। উভয় সম্প্রদায়েরই চতুর্দ্দশ দেবতা সম্পূজিত হয়, এবং বিবাহাদি কতিপয় সামাজিক কার্য্যেও বিশেষ সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। শত শত বৎসরের বিচ্ছেদেও তাহাদিগের এতাদৃশ সামঞ্জস্য প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আবার কেহ যেন চাক্‌মাদিগকে ত্রিপুরাজাতির শাখাবিশেষ বলিয়া সন্দেহ না করেন। পূর্ব্বোক্ত "চাটিগাছাড়া"তে "ত্রিপুরাপাড়া"র স্বতন্ত্র বর্ণনা রহিয়াছে। ফলকথা, চাক্‌মাগণও এফ্, মুলার প্রমুখ নরজাতি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নির্ণীত "লোহিতিক" বা তিব্বতী ব্রহ্মা" শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে। অদ্যাপি হিমালয়ের সানুদেশবাসী ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বিরল নহে। এমন কি, সুদূর তিব্বত, চীনবাসীরাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশপ্রসূত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। বক্ষ্যমাণ চাক্‌মাদিগের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে গ্রাণোভিল সাহেবের মতানুবর্ত্তনে ইহাদিগকে "লোহিতিক ক্ষত্রিয়" অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়বিশেষ ধরিয়া লওয়া যায়; তিব্বতের 'মহাযানধর্ম্ম'ই তাহাদের আদি ধর্ম্ম হইবে।

ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত যে, ব্রহ্মদেশে বাসনিবন্ধন ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ এবং পরিপুষ্ট হইতে থাকে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপনের পরেও প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাব অব্যাহতরূপে চলিতেছিল। অনন্তর সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের হিন্দুসাধারণের সংমিশ্রণে পাওয়া যায়। তাহার বহু

হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়।

বৎসর পরবর্ত্তী রাজা শুকদেব রায়ের নামেও হিন্দু-গন্ধ আসে। কিন্তু তখনও বোধ হয় হিন্দু দেবদেবীগণ চাক্‌মাসমাজে আধিপত্য ক্রমে হিন্দুভাব পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠে। "পাগলা রাজা"র কৃচ্ছ্রসাধনার সংবাদে হিন্দুধর্ম্মেরই ছায়া স্থাপন করিতে পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রাজা জব্বর খাঁ "শ্রীশ্রীজয়কালী জয় নারায়ণ" নাম মস্তকে ধারণ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহারাজা ধরমবক্স খাঁর সময়ে হিন্দুধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি হিন্দুধর্ম্মের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। রাঙামাটি রাজভবনে জয়কালী সংস্থাপিত করেন। এবং পিতার অনুকরণে মোহর মধ্যে নামের উপরিভাগে "জয়কালী সহায়" খোদাইয়া ছিলেন। দৈনিক কালীপূজার নিমিত্ত নিয়মিত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীগণেরও যথাবিধি পূজা এবং নিয়মিতরূপে যাবতীয় হিন্দুপর্ব্ব প্রতিপালিত হইত।-ইত্যাদি বিস্তারিত রূপে তৃতীয় পরিচ্ছেদাংশে বর্ণিত হইয়াছে। তদীয় মহীয়সী মহিষী কালিন্দীরাণীর শাসনের প্রথম ভাগে হিন্দুধর্ম্ম আরও পরিস্ফুট হয়। তিনি বারমাসেই হিন্দুপর্ব্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন। নিয়মিত শিব ও বিষ্ণুপূজা এবং দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিষহরী ও নবগ্রহাদির যথাবিধি অর্চ্চনা হইত। বিশেষতঃ ফাল্গুনের অমাবস্যায় রাণী মহোদয়া স্বয়ং কালীপুর কালীমন্দিরে গিয়া পূজা প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতিরেকে হিন্দুমতে তাঁহার নিত্য পূজাও ছিল, পূর্ব্বে ইহাও বিবৃত করা হইয়াছে।

কিছুকাল পরে আরাকানের প্রসিদ্ধ ভিক্ষু সংঘরাজ হার্‌বাংএর গুণামেজু ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া রাজালয়ে উপস্থিত হন। তাঁহারা রাণী মহোদয়াকে বৌদ্ধধর্ম্মে প্ররোচিত করেন (১)। ক্রমে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; তিনি শুভদিনে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর রাণী বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সদনুষ্ঠান সমূহ

বৌদ্ধধর্ম্মের পুন প্রবর্ত্তন।

(১) কেহ কেহ বলেন, ইঁহাদের পূর্ব্বে সিংহলে অধীতবিদ্য হরিঠাকুর নামধেয় জনৈক চট্টগ্রামবাসী ভিক্ষু রাণীকে বৌদ্ধধর্ম্মে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। মিঃ রিজ্‌লীও এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কিছুদিন পরে আরাকান হইতে একজন প্রসিদ্ধ ফুঙ্গি আসিয়া রাণীকে বৌদ্ধধর্ম্মের সমর্থন এবং পৌত্তলিকতায় বাধা দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।" (Tribes and castes of Bengal, p. 171) তবে ইঁহার কথাতে কেমন কেমন বোধ হইতেছে। "পৌত্তলিকতায় বাধা দিতে" "ফুঙ্গির" কোন অনুরোধ ছিল কিনা, সন্দেহ আছে। কেননা বৌদ্ধধর্ম্মও পৌত্তলিকতা বর্জ্জিত নহে।

সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার এই প্রথম ও প্রধান কার্য্য রাজানগরের রাজভবন পার্শ্বে পবিত্র "মহামুনি" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা। মন্দির বক্ষস্থিত প্রস্তর ফলকের অক্ষরে অক্ষরে রাণীর প্রগাঢ় বুদ্ধবিশ্বাস এবং অলৌকিক উদারতা প্রতিভাত হইতেছে। বিধবা হইবার প্রায় ৩৮ বৎসর পরে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর তিন বৎসর মাত্র পূর্ব্বে রাণী বৌদ্ধধর্ম্ম সম্মত প্রথম অনুষ্ঠান—এই মহামুনি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিনি একটী মহাদান করিয়াছিলেন। অনন্তর স্বীয় প্রজাদের মধ্যে বৌধধর্ম্ম প্রচার করিতে তৎপর হইলেন। এই কারণে পালি হইতে অমিয় বুদ্ধ চরিত্ত অনূদিত করাইয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণের ইচ্ছা কিন্তু করালকাল তাঁহার এই পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া রাণীর বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে। জরাপীড়িত দুর্ব্বল জীবতে কত আর 'কর্ম্ম' আশা করা যাইতে পারে?

বুদ্ধদেব হিন্দুধর্ম্মেরই অবতার বিশেষ। সুতরাং তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম কখনই হিন্দুত্ব বর্জ্জিত হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "গীতায়" যে কর্ম্মের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন (১), বুদ্ধ অবতারে তাহাই পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে। কেবল গীতোক্ত ধর্ম্মে ভগবান কর্ম্ম হইতে পৃথক, বৌদ্ধধর্ম্মে তিনি কর্ম্মে বিলীন হইয়াছেন! হিন্দুর "তত্ত্বমসি" ভাব "সোঽহম্" জ্ঞানে উন্নীত হইলে 'ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধো'পদিষ্ট "নির্ব্বাণ"

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

---

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "কর্ম্মযোগ" নামধেয় তৃতীয় অধ্যায়ে আছে;—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমাধি গচ্ছতি॥ ৪।"

'কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেহই 'নৈষ্কর্ম্ম্য' লাভ করিতে পারে না, এবং কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না॥ ৪।'

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮।"

'তুমি সর্ব্বদা কর্ম্ম কর। যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল। কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না॥ ৮।'

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ৯।"

'অতএব তুমি সর্ব্বদা ফলাসক্তি বিরহিত হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন॥ ৯।'

লাভ হয়। অতএব বৌদ্ধগণকে অহিন্দু বলা বা বিবেচনা করা কদাপি যুক্তিসঙ্গত নহে। সম্প্রতি জাপানের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ওকাকুরা নামা প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে এতদ্‌সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহার কথায় বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের এক বিশেষ অঙ্গ। তবে ধর্ম্ম মাত্রেরই অধিকারীভেদ আছে। 'কর্ম্মে' বদ্ধপরিকর হইবার পূর্ব্বে লক্ষ্য ধরিয়া উপযুক্ত হওয়া চাই। তাই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মনীষিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের কবল হইতে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায়তঃ স্বার্থ-সংরক্ষণে উত্থিত হইয়াছিলেন।

মহীয়সী কালিন্দীরাণী শেষ জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমরণ হিন্দুধর্ম্মানুদিষ্ট পূজাদিও আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম চাকমা সমাজ হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। পরবর্ত্তী রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়েরও কিছুকাল ধরিয়া ধরমবক্স খাঁর প্রতিষ্ঠিত জয়কালীর পূজার্চ্চনা যথারীতি চলিয়াছিল। পরে একবার রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক শিশু কন্যা রোগাক্রান্ত হইলে; তিনি কালী-সমীপে বহু আরাধনাতেও স্নেহ প্রতিম কন্যারত্নকে রক্ষা করিতে না পারিয়া, কালীমূর্ত্তিকে পার্শ্ব প্রবাহিতা কর্ণফুলী জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সেই হইতে চাকমা সমাজ হইতে কালী পূজা উঠিয়া গিয়াছে। তবে এখনও কেহ কেহ হিন্দুদের সংস্থাপিত কালীর নিকট "মানস" পূজা প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ্যে এই কালীপূজা রূপান্তরিত হইয়া "হোইয়া পূজা" আখ্যায় প্রচলিত হইয়াছে। অদ্যাপি রাজবাড়ীতে এবং স্কুলের ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানে সরস্বতী পূজাও হইয়া থাকে, এবং শিবপূজা ও লক্ষ্মীপূজা বিকলাঙ্গ হইয়া কোনরূপে মানরক্ষা করিতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের শোচনা।

বিগত সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ২৫ জন পুরুষ ও ১৭ জন স্ত্রীলোক, এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় ২ জন পুরুষ হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। বৈষ্ণবেরাই এই হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ প্রবর্ত্তনের মূল। তজ্জন্য তাঁহারা অবশ্য হিন্দুসমাজের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। চট্টগ্রামের "জ্যোতিঃ" সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহোদয় বহুদিন ধরিয়া হিন্দুসমাজের গৌরব আর্য্যমিশন ও রামকৃষ্ণসম্প্রদায়কে এই বিশৃঙ্খলধর্ম্মী চাকমাসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বারংবার আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এযাবৎ তাঁহাদিগের কাহারও কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তথাপি নিতান্ত স্বল্পশক্তি মাত্র সম্বল বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধু চেষ্টা

নানাধর্ম্ম।

সবিশেষ প্রশংসার্হ। চাক্‌মা বৈরাগী তুলসীমালা ও ডোরকপীনধারী। তাহাদের মুখে প্রায়ই হরিনাম শুনিতে পাওয়া যায়। মদ, মাংস বর্জ্জনাদি কঠোরতাতেও তাহাদিগের আসক্তি দেখিয়া অশেষ আশার সঞ্চার হয়। কালিন্দীরাণীর জীবনী আলোচনায় মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিও তদীয় অনুরাগ দেখিয়াছি। ইহা তাঁহার অসীম উদারতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তাহার ফলে পীরের সিন্নী প্রভৃতি মুসলমানী আচারও সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন যীশুসেবক মিশনারিগণও এই সরল প্রাণ পার্ব্বতীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মালোক বিস্তারের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের বিপুল অধ্যবসায়, বস্তুতঃ হৃদয়ে অনুভব করিবার যোগ্য! কিন্তু এত চেষ্টা চাক্‌মাসমাজে অতি অল্পই ফলপ্রসূ হইয়াছে। আজ প্রায় শতাব্দী কালের সস্নেহ আহ্বানে সাধারণ সম্প্রদায় হইতে অতি মুষ্টিমেয়—৩৪ জন মাত্র ভক্তিভাজন যীশুর মন্দিরযাত্রী হইয়াছে। ভদ্র পরিবারসম্ভূত কেবল বাবু দুর্গাকিঙ্কর দেওয়ান এই পথের পথিক হইয়াছিলেন; কিছুদিন পরে তদ্ধর্ম্মাবলম্বীলোকে মনের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ায়, তিনি পুনরায় বুদ্ধদেবের "নির্ব্বাণ" পথ ধরিয়াছেন।

চাক্‌মাদিগের ধর্ম্মকার্য্য মাত্রেই প্রথমে "স্থাপত্য পূজা" হয়। ইহাতে বসুমতী, চুঙ্‌লাং (পুরুষ) এবং পরমেশ্বরী (প্রকৃতি) পূজা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সেই তিন প্রধান শক্তিতে এজগৎ সৃষ্ট, সেই আদিম শক্তিত্রয়ের সাধনা যাবতীয় মানবেরই সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য। যে জাতি যত অধিক পরিমাণে এই শক্তিত্রয়ের ভক্ত রাখেন, ধর্ম্মজগতে তাঁহারাই তত অধিক উন্নত।

দেবতা।

এতদ্ভিন্ন ইহারা আরও নানা দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মের অধিকার কালে চাক্‌মাসমাজে তেত্রিশ কোটী দেবতার অনেকেই প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আক্রমণে প্রায় সকলেই প্রভুত্বচ্যুত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শিব, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং নবগ্রহ ভিন্ন আর কাহারও পূজা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ত্রিপুরাদিগের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক জাতীয় প্রধান দেবতা আছেন, তাঁহাদের বর্ণনা হইতেও হিন্দু দেব-দেবীর গন্ধ আসে। তৎ যথা :—

১। বৃহত্তারা—সৃষ্টির পরে ইনি লক্ষ্মীকে আনিয়া পৃথিবী ধনধান্যে পরিপূর্ণ করেন (১)।

(১) বোধহয় ইনি বৃহৎ—তারা অর্থাৎ স্বয়ং সূর্য্যদেব।

২। মা-লক্ষ্মী—ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী।

৩। ধলধ্বরী—কার্পাসাধিকারিণী। (১)

৪। পরমেশ্বরী—আদ্যাশক্তি (প্রকৃতি)।

৫। গঙ্গা—জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী (২)। ইহার নিকট পুণ্য, অভয়, নিরাময় প্রার্থনা করা হইয়া থাকে।

৬। স্থান দেবতা—বাস্তদেব।

৭। মত্যা—ব্যাঘ্রবাহন; ইহাকে পূজার ফলে লোকে নিঃশঙ্কচিত্তে জঙ্গলে ভ্রমণ করে। (৩)

৮। হাত্যা।—তদীয় উপদ্রব হইতে জুম রক্ষার নিমিত্ত পূজা করা হয়।

৯। ফুলকমরী—ফোঁড়া পাঁচড়াদির দেবতা।

১০। মেলকমরী—বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি মারীভয়োৎপাদিকা দেবতা।

১১। মোহিনী।—অনেকস্থলে ইহার আশ্রয় আছে। তথায় নিষ্ঠীবন ত্যাগে কি প্রসবাদি করিলে "মোহিনী দেবতা" আক্রমণ করেন; তাহাতে দদ্রু প্রভৃতি নানা সংক্রামক রোগ জন্মে।

১২। কালাথেদয়—ইনি নানাস্থানে থাকিয়া আক্রমণ করেন। ইহার দেহ-তাড়িত বাতাসও অনিষ্টকারী।

১৩। ভূত—ইনি যেখানে সেখানে মনুষ্যের উপর উপদ্রব করেন।

১৪। রাখ্যোয়াল—রক্ষাকর্ত্তা। তিনি নানা আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

চাক্‌মাদিগের মতে এই চতুর্দ্দশ দেবতা পৃথিবীর পাহারাওয়ালা। স্বচ্ছন্দ বিচরণের নিমিত্ত ইঁহাদিগকে পূজাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে হয়।

পূজা ও মন্ত্র।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কোন দিন ইহাদের পূজা হইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই এই চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেবদেবীই নাকি স্ব স্ব চক্রে বাস

---

(১) ত্রিপুরাগণ ইঁহাকে "খুলুমা" আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে।

(২) ত্রিপুরাদের মতে ইঁহার নাম—তুই মা।

(৩) হাওড়া—খুরুট পঞ্চাননতলার 'দক্ষিণরায়' এবং চাক্‌মাদিগের দেবতা "মত্যায়" মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। "দক্ষিণরায়ও ব্যাঘ্রবাহন;" তবে কিনা তিনি কেবল ব্যাঘ্রের দেবতা মাত্র। ("বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের"—দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

করেন। এই নিমিত্ত পূজাকালে ক্রিয়াস্থল ও সমবেত সকলকে খেয়িয়া সূত্র-বেষ্টন করে। যাহারা এই সীমামধ্যে থাকে, তাহারাও নাকি আংশিক ফল পায়। বলা বাহুল্য, এ সমুদয় হিন্দুত্ব বিজড়িত তান্ত্রিক বৌদ্ধমত! তবে ইহারা বলে, এসকল ইহকালের পূজা; পরকালের নিমিত্ত ফড়া-তারা-চাক্কার সেবাই কুলধর্ম্ম। যাঁহারা পরমবুদ্ধের সাধনা শিখিয়াছেন; তাঁহারা উপরোক্ত পূজাগুলিকে "মিথ্যা দৃষ্টি পূজা" বলিয়া থাকেন। এস্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, চাক্‌মাগণ বিশেষতঃ ক্রিয়াকর্ত্তা পূজাকালে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকে। "সস্ত্রীকম্ ধর্ম্মমাচরেৎ"—হিন্দু-ধর্ম্মের এই সনাতন বিধি ইহাদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রে অধিকাংশ বিকৃত বাঙ্গালা শব্দ, মধ্যে মধ্যে নানা যাবনিক শব্দও মিশ্রিত হইয়াছে। এস্থলে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল। শুদ্ধীকরণের নিমিত্ত নদী হইতে জল গ্রহণকালে এই মন্ত্রে প্রার্থনা হইয়া থাকে,—

"দেরে মা গঙ্গা, দেরে পানি
অবোধ মানাই (১) শুদ্ধ করি;
শিল ভাঙি পাথর করং (২)
পাথর ভাঙি দৈর্য্যা (৩) করং
দৈর্য্যার পানি কোষে (৪) তলং (৫)
অবোধ মানাই শুদ্ধ করং।"

চাক্‌মাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম—"আগরতারা" অর্থাৎ পৌরাণিক শাস্ত্র (৬)।

---

(১) মানাই—মনুষ্য; (২) করং—করি; (৩) দৈর্য্যা—দরিয়া, সমুদ্র; (৪) কোষে—গণ্ডুষে; (৫) তলং—তুলি।

(৬) 'আগর'—পূর্ব্বের, 'তারা'—শাস্ত্র; সুতরাং 'আগরতারা' শব্দের অর্থ—'পৌরাণিক শাস্ত্র।' কিন্তু দেখিতেছি, "বৌদ্ধ-পত্রিকা" সম্পাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন "অগ্রত্রাণ" (১ম ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা)। তিনি এই অর্থ কিরূপে নির্দ্দেশ করিলেন—বুঝিলাম না। আমাদের এতাদৃশ মন্তব্য "বৌদ্ধবন্ধু"তে প্রকাশ হইলে "পত্রিকা"র সম্পাদক ৺সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া এক বকলমি প্রতিবাদপত্র ছাপাইয়া লেখকের উপর নানা কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করেন। লেখক তাহাদের ভ্রমপ্রদর্শন এবং উক্ত অন্যায় ব্যবহারের জন্য নোটিশ প্রদান করিলে, তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেহ কেহ 'আগর'—অক্ষর, 'তারা'—আঁট, অক্ষরের আঁট অর্থাৎ গ্রন্থ অর্থও করেন। সে যাহা হউক বাবু ত্রিলোচন দেওয়ানের ঐকান্তিক অনুরোধে চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মবংশ ভিক্ষু মহোদয় কিছুকাল একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি হইতে ইহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মুখপত্র "বৌদ্ধ-বন্ধু" ও "বৌদ্ধ-পত্রিকা"য় প্রকাশ করিতেছিলেন, পত্রদ্বয়ের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বোধহয় ইতি করিয়াছেন।

মোট সপ্তদশ খানি "তারা" বা শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। যথা—১। মালেম তারা (মালেমহবিয়ের উপাখ্যান), ২। ছাদিংগিরি তারা, ৩। আনিজা তারা (অনিত্য কর্ম্মকথা), ৪। আরেণ্ তামা তারা, ৫। সিগল-মোগল তারা (জয়মঙ্গল সূত্র), ৬। সরকদান তারা, ৭। দাসাপারামি (দশ পারামিতা) তারা, ৮। বড়কুরুক তারা, ৯। ছোটকুরুক তারা, ১০। শ্রীপুদয়াতারা (ত্রিকুড্ড সূত্র), ১১। সুরাদিজা তারা, ১২। পুদুম্‌ফুলু তারা, ১৩। ফুদুম্‌ফুলু তারা, ১৪। সাহসফুলু তারা, ১৫। চেরাগফুলু তারা, ১৬। স্বামীফুলু তারা এবং ১৭। রাখেম্‌-ফুলু তারা। এই সমুদয়ের ভাষা পালি,—তবে কিনা অধুনা প্রায় সমস্ত তারারই, পাঠ দূষিত এবং বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থলে চাক্‌মা ভাষা মিশ্রিত হইয়া সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোনরূপে পাঠবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির ন্যায় "আগর তারা"ও অনেকের ঘরে তালপত্রে—চাক্‌মা অক্ষরে লিখিত আছে। এবং অনুষ্ঠান বিশেষে "তারা"বিশেষ ভিক্ষু বা শ্রমণ কর্ত্তৃক পঠিত হয় তন্মধ্যে 'মাথা ধুইতে' (১) "বড়কুরুক তারা" ও "ছোটকুরুক তারা" 'বড় বিবাহে' (২) "সিগল মোগল তারা," "আদি পূজা" অর্থাৎ ধর্ম্মপূজায়—"মালেম তারা" "দাসাপারামি তারা" ও "সাহসফুলু তারা" মৃত্যুর পর মুখে পিণ্ড দিতে "আনিজা তারা" রাজা বা বড়লোক মরিলে "আরেণ্ তামা তারা" পিণ্ডোৎ-সর্গ কালে—"মালেম তারা" "পুদুম্‌ফুল তারা" "ফুদুম্‌ফুল তারা" "শ্রীপুদয়া তারা" "সুরাদিজা তারা" "সাহসফুল তারা" ও "দাসাপারামি তারা," শ্মশানে দাহন সময়ে "ছাদিংগিরি তারা" এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধে "রাখেমফুলু তারা" পঠিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট "চেরাগ্‌ফুলু" "স্বামীফুলু" এবং "সরকদান তারা"ত্রয় কেবল ধর্ম্মকথা শ্রবণ মানসেই পাঠ করা হয়। এসমুদয় "আগরতারা" অর্থাৎ পৌরা-ণিক শাস্ত্র হইলেও বৌদ্ধানুশাসনেই যে ইহাদের হাতে আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্ব্বকার "যুগভদ্র", "যুগকালাম", "জ্ঞানপ্রদীপ" "মানবজনম", "ফকিরী কালাম" নামধেয় হস্তলিখিত পাঁচখানি আধ্যাত্মিক গ্রন্থও ইহাদিগের

শাস্ত্র।

(১) বৎসরান্তে পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত এবং জাতিদের কাহাকেও বাঘে খাইলে "ঘিলা কুচোইর পানি" দিয়া মাথা ধুইতে হয়, পরে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(২) রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উন্নতপ্রথার বিবাহ।

কোন কোন প্রাচীন উন্নত পরিবারে পরিদৃষ্ট হয়। এগুলি হিন্দুধর্ম্মেরই অমৃতময় ফল। জলটঙ্গীর উপর শিব ও পার্ব্বতী বসিয়া যে সমুদয় দুরূহ আধ্যাত্মিক সমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রন্থনিচয় তৎসমুদয় কথাতেই পরিপূর্ণ।

কালিন্দিরাণী কর্ত্তৃক রাজানগরে "মহামুনি" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহার সঙ্কলিত ইষ্টকময় ক্যং গৃহ প্রস্তুত হয় নাই বটে, তবে সেই বংশ বেত্রবিনির্ম্মিত তৃণাচ্ছাদিত প্রাচীন ক্যং অদ্যাপি স্বর্গীয়া রাণীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রাণতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাঙামাটি রাজবাড়ীতেও একখানি ক্যং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা রাজভবনের পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত দীননাথ ভিক্ষু মহোদয়ের উপর এই মঠের অধ্যক্ষতা রহিয়াছে। এই 'ক্যং'এ (বিহারে) একটী মনোহর বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। এতদ্ভিন্ন চাকমাদিগের অধিকাংশ স্থায়ী গ্রামেই অধুনা ক্যং এবং বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা অন্ততঃ একজন ভিক্ষু বা শ্রমণের তত্ত্বাবধানে থাকে। গ্রামবাসীরা বুদ্ধদেবের সেবার নিমিত্ত যে সমস্ত ভক্তি উপাচার অর্পণ করে, তদ্বারা মঠাধ্যক্ষগণের ভরণপোষণ চলিয়া যায়। সম্প্রতি বর্ত্তমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হাচিন্সন মহোদয়ের উৎসাহে—রাজাবাহাদুরের তৎপরতায় রাঙামাটিতে এক বিরাট ইষ্টকময় বিহার ও তন্মধ্যে পবিত্র মহামুনি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তদীয় সার্কেলের প্রজাগণ হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। তাঁহাদের আশা আছে, প্রতি 'মাঘীপূর্ণিমা'তেই এখানে মেলার বন্দোবস্ত করিবেন।

ক্যং বা বিহার।

বৌদ্ধমতে চাকমাদিগের মধ্য হইতেও কেহ কেহ সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক "রড়ি" (শ্রমণ) ব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু বিরাট সমাজের পক্ষে কৃচ্ছ্রব্রতাচারী চীবরধারী শ্রমণ সংখ্যা অতিশয় সামান্য। গড়ে প্রায় চারি শত পুরুষ খুঁজিলে তবে একজন "রড়ী" পাওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ চাকমা "রড়ীদিগের" আচার ব্যবহারেও তাদৃশী কঠোরতা নাই। তাঁহারা যেন স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত গৃহী বিশেষ। অনেকে পরিধেয় চীবর বস্ত্রে সাধারণতঃ কাছাও দিয়া থাকে। কিন্তু এতাদৃশ প্রশ্রয় পাইয়াও অনেকে শ্রমণ-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম্মে প্রবেশ করেন। তাঁহাদিগের লোথক বলা হয়। চাকমাসমাজে "লোথক" নিতান্ত বিরল নহে। আবাল এই কৃচ্ছ্রব্রত প্রতিপালন করিয়া এ যাবৎ তিনজন মাত্র (১) "ঠাকুর" অর্থাৎ 'ভিক্ষু' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

রড়ী লোথক ও ঠাকুর।

(১) শ্রীযুক্ত দীননাথ ভিক্ষু রাজবাহাদুরের রাঙামাটি (ক্যং) মঠাধ্যক্ষ। শ্রীযুক্ত পুণ্য-

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাদিগের সামাজিক প্রায় যাবতীয় যজন পূজনাদি 'ওঝা-দের দ্বারা চলিয়া থাকে। সমাজে "রুড়ী" ও "ঠাকুরের" অভাবই ইহার প্রধান কারণ হইবে। তবে কিনা ইহাও সত্য যে, বৌদ্ধধর্ম্মবিরুদ্ধ ক্রিয়ার প্রতি "রুড়ী" ও "ঠাকুরগণ" ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং সমাজে "ওঝা" শ্রেণীর অবশ্য প্রয়োজন। সমাজের বহুদর্শী ও ক্রিয়া প্রণালীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই "ওঝা" নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত হইলে তাহাদের উত্তরাধিকারিগণও এই ব্যবসায় চালাইতে পারে। অন্যথা সমাজ তজ্জন্য বাধ্য নহে। "চুঙ্‌ লাং" প্রভৃতি কতিপয় অনুষ্ঠানে "ওঝাকে" পূর্ব্বদিন নিমন্ত্রণ করিতে হয়। সে রাত্রি "ওঝা" অতি পবিত্রভাবে দেব-দেবী স্মরণ করিয়া ভাবী অনুষ্ঠানের ফলাফল চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করে। বলা বাহুল্য স্ত্রীসহবাসাদি দুষ্কর্ম্ম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে। ইহাতে "ওঝা" স্বপ্নে ক্রিয়াকর্ত্তার ইষ্টানিষ্ট পরিজ্ঞাত হয়।

বলিতে কি, ইহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াও ভগবান বুদ্ধোপদিষ্ট পঞ্চশীল (১) বা দশশীল (২) আচরণে সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ দীক্ষা গ্রহণকালে তাহারা এই পঞ্চশীল ব্রত প্রতিপালন করিবে বলিয়াই প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া থাকে। এবং ফলে সাতদিন মাত্র অতিবাহিত হইলেই ইতি শেষ করিয়া রাখে। "ওয়াছু" অর্থাৎ আষাঢ়ের পূর্ণিমা হইতে যে "ছাদাং" আরম্ভ হয় তাহা "ওয়াগ্যা" অর্থাৎ আশ্বিনের পূর্ণমাসী পর্য্যন্ত তিনমাস ধরিয়া চলিয়া থাকে। বস্তুতঃ "ছাদাং" বৌদ্ধ মাত্রেরই অতি পবিত্র অনুষ্ঠান। এ সময়ে তাহাদিগকে সুস্বাদু খাদ্য, মনোরম পরিচ্ছদ এবং স্ত্রী-সঙ্গম প্রভৃতি পরিবর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরাট চাক্‌মা সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে মাত্র এই পবিত্র ব্রত পালনে তৎপর দেখা যায়। পক্ষান্তরে এই পরিব্রাচার ভিক্ষুকগণের নৈমিত্তিক ব্রত। তাঁহারা ইহা ছাড়া এ কয়মাস স্ব স্ব 'ক্যাং'এ রাত্রি বাস করিতে বাধ্য। অধুনা ইহাও সম্যক প্রতিপালিত হয় না।

চান্দ ভিক্ষু 'কাচলং' তীরে অন্য একটী ক্যাং-এ বাস করিয়া থাকেন। কাচালঙেই অপর যুবক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরত্ন ভিক্ষুনামে পরিচিত, তিনি মহাপ্রুং ক্যাং-এ বাস করেন।

(১) পঞ্চশীল—১ প্রাণী হত্যা ২ চুরি ৩ পরস্ত্রী হরণ ৪ মিথ্যা কথন এবং ৫ মাদক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ।

(২) দশশীল—পঞ্চশীল ও ৬ বৈকালিক ভোজন ৭ নৃত্য-বাদ্য-গন্ধাদি সেবা। ৮ ও ৯ উচ্চাসন ও মহাসনে উপবেশন এবং ১০ অর্থস্পর্শ নিষিদ্ধ।

[৯]

যাহা হউক ইহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সংখ্যায় নিতান্ত কম নহে; তবে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংঘাতে অধুনা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। তন্মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মের অধিকার যদিও বিস্তর, কিন্তু সেই সমুদায় তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রভাবে এতই দূষিত যে, হিন্দুসমাজ কোনরূপেই তাহা গ্রহণে সম্মত হইতে পারে না। মোটের উপর বৌদ্ধধর্ম্মেরই সর্ব্বাধিপত্য স্বীকার করা যায়। বিষু, "ওয়াছু", "ওয়াগ্যা",

পর্ব্ব ও নিয়ম।

"মাঘী পূর্ণিমা" প্রভৃতি সমস্তই বৌদ্ধ পর্ব্ব। তবে কিনা ইহাদের "নবান্ন" নামক আর এক পর্ব্ব আছে, তাহা অবশ্য হিন্দুসমাজ হইতেই পরিগৃহীত। এতদ্ভিন্ন অপর সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠানকেই ব্রত বা নিয়ম আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। তৎসমুদয়ের মধ্যে "চুঙ্লাং" "চক্রব্যূহ", "থামিং টং" "টাঙ্গোনোৎসর্গ" প্রভৃতি সচরাচর প্রচলিত দেখা যায়। "ধর্ম্মকাম" এবং "হাজারবাতি"ও বৌদ্ধানুষ্ঠান বটে, কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলিয়া সাধারণে করিবার সাধ্য নাই। তাহা ছাড়া, শিবপূজা, লক্ষ্মীপূজা, হোইয়া (কালী) পূজা, নবগ্রহ পূজা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর অর্চ্চনাও প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, গাভীদান, পারঘাটায় শুদ্ধমুক্তি ইত্যাদি ব্যবস্থাও এই সমাজে বিরল নহে। অপর পক্ষে "কেরপূজা", "সত্যপীরের সিন্নি" প্রভৃতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। নিম্নে এই সকল পর্ব্বনিয়মাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে।—

বিষু।—মহাবিষুব সংক্রান্তি বৌদ্ধদিগের প্রধান ও পবিত্র পর্ব্বাহ। বসন্তের অবারিত অনুগ্রহে চৈত্রমাস প্রকৃতিকে মনোরম করিয়া তোলে; আর তাহারই সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টিতে বৌদ্ধ সমাজের অতি নিম্নস্তরে পর্য্যন্ত বিশ্বজনীন প্রেমপ্রবাহ বহিতে থাকে। এইদিন বৌদ্ধজননী বিপুল মঙ্গলায়োজন সহকারে পরিবারের শুভকামনা করেন। কেবল ইহা নহে, ধর্ম্মের যাহা প্রধান অঙ্গ, এবং যাহা কর্ত্তব্যের শাসনে নিয়ামিত, এ হেন শুভ অবসরে সে সমুদায় মহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহও অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ প্রধান এসিয়াখণ্ডে প্রায় সর্ব্বত্রই এই একই উদ্যাপনা—ভক্তগণ অতি সাবধানে শুচিবিধান করিয়া ভক্তিপূত উপচার-থালা মাথায় পবিত্র বুদ্ধমূর্ত্তির সন্নিধানে প্রাণের বিনীত নিবেদন জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত হয়। কিছুদিন হইল, চিৎমরং নামক স্থানে এক বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে; বিষু প্রভৃতি পর্ব্বাহে তথায় অনেকের সমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আরাকান ও চট্টগ্রামে বুদ্ধদেব "মহামুনি" মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই

চাকমা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই সেই সুদূর মহামুনিদর্শনে গমন করে। (১)

'ফুলবিষু' অর্থাৎ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন হইতে ইহাদের তীর্থ কার্য্য আরম্ভ হয়।

তীর্থ-কার্য্য।

প্রথমে স্নানাদিতে শুচি হইয়া মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত বারান্দায় বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী ঘুরিয়া আকুল প্রাণে বুদ্ধ নাম কীর্ত্তন করিতে থাকে। এরূপে কিছুকাল প্রদক্ষিণের পর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক মহামুনির শ্রীচরণপ্রান্তে উপচার-থালা এবং প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা স্থাপন করতঃ ভূমিগত প্রণিপাত করে। তদন্তর মন্দিরমধ্যেই পুনরায় বারংবার মহামুনিমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিতে থাকে। অবশেষে যখন শ্রান্তিক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন বাসায় গিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লয়।

প্রদক্ষিণকালে ইহাদের সুশৃঙ্খলার ভাবে—সৌন্দর্য্যের খেলায়—এবং সর্ব্বোপরি পবিত্র ধর্ম্মোন্মাদনায় দর্শকের পাষাণ হৃদয়ও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়! সমবয়স্ক স্ত্রী পুরুষ দলে দলে গলাগলি করিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতে থাকে। মুখে পবিত্র বুদ্ধ নাম, এবং মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব উৎসাহোদ্দীপক খল খল হাস্যঘটাজড়িত "রেইঙ্ খারিয়া" (২) মন্দির বিকম্পিত—মেলাস্থল মুখরিত করিয়া তোলে। অহো, সেই বিহ্বলবিভ্রান্ত নৃত্য এবং উদাস-বিভোর সঙ্গীত পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের অভিনয় দেখায়! কেবল মন্দিরসন্নিধানে নহে, নৃত্য-গীতের এতাদৃশ আনন্দপ্রবাহ পথে—ঘাটে—মন্দিরে—প্রাঙ্গণে সর্ব্বত্রই তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে।

এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদিগের কোন বিশেষ সাজসজ্জা থাকে না। অবগুণ্ঠন ব্যপদেশে কেবল একখানি লোহিত কি শুভ্র 'ওড়না' মস্তকোপরি হইতে পশ্চাদ্দিকে ঝুলাইয়া দেয়। পুরুষেরা বিশেষতঃ অনূঢ় যুবকগণ কর্ণে পুষ্পগুচ্ছ, মস্তকে

---

(১) রাজানগরের "মহামুনি"র কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে অন্তির 'পাহাড়তলী' নামধেয় বৌদ্ধপ্লাবিত গ্রামে মঙ্ রাজা বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত আর একটি মহামুনিমূর্ত্তি আছেন, ইহাই অধিকতর প্রাচীন। উভয় স্থানেই এই সংক্রান্তি উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় বটে, কিন্তু পাহাড়তলীর জনতা সংখ্যা গড়ে রাজানগর মেলার প্রায় দ্বিগুণাধিক হইয়া থাকে। তবে রাজানগর মেলায় প্রায় তিন চতুর্থাংশেরও অধিক যাত্রী চাকমা। স্বকীয় ও স্বজাতীয় রাজার প্রতি ভক্তিমত্তাই যে উহার প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) "রেইঙ্ খারিয়া"—কুইখানি।

বঙ্গিন টুপি, গলদেশে আপাদবিলম্বিত রুমাল ও ফুকাবানা, গিল্‌টির শিকল প্রভৃতি নানাবিধ গহনা ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়। শুধু ইহা নহে, কেহ কেহ বা আবার চুণ, হলুদ বা কালী মাখিয়া অদ্ভুত সং সাজে। এতদ্ভিন্ন কেহ বেহালা, কেহ কন্সার্ট, কেহ বা বাঁশী, অপর কেহ বা দুই তিনটী যন্ত্র যুগপৎ ধ্বনিত করিতে থাকে। ফলে তাহাদের সেই উদ্দাম ব্যবহারে—আমোদের উপসংহার না হইতেই তৎসমুদয় যন্ত্র ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। অন্ততঃ প্রায় সকল স্ত্রী পুরুষেরই হাতে অন্ততঃ একখানি করিয়া পাখা (১) থাকে। যুবকেরা তাহা হয়ত বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য করিবার সময়ও ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আনন্দে অধীর হয়। এবং অধিকাংশ স্থলে ক্লান্তি দূরীকরণমানসেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোথাও বা দেখা যায়, কোন প্রণয়িনী শ্রান্ত-ক্লান্ত হৃদয়েশ্বরকে তাহার শীতল করিতেছে, আর বিমুগ্ধ প্রণয়ী সেই কোমলকর-সঞ্চালনের প্রতি সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! আবার কোথায়বা শ্রমালসপীড়িতা কুমারী যুবতীকে কোন অনূঢ় যুবক ব্যজনে তৎপর। হঠাৎ কোন শুভ নিমিষে চারি চক্ষুতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলিয়া যায়, নীরবে—নিশ্বাসে উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অধোমুখী রহে! এইরূপে তথায় প্রেমের প্রথম অভিনয়—পূর্ব্বরাগ সূচিত হয়। অবশেষে যুবক যুবতীর হস্তধারণে সাহসী হয়, তখন আর হৃদয়ের উদ্‌ভ্রান্তভাব মুখের কপাটে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অনেকেই এইরূপে জনসংঘ হইতে জীবনসঙ্গিনী নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া থাকে। পরস্পরের মত জানিতে পারিলে, পরিশেষে তাহারা স্ব স্ব অভিভাবকের গোচরীভূত করে; এবং তাহাতেই বিবাহ হইয়া যায়।

অবশ্য এতাদৃশী ঘটনা তীর্থক্ষেত্রের কলঙ্ক বিশেষ। হায়, বর্ত্তমানে অনেক হিন্দু তীর্থস্থান হইতেও এইরূপ নানা ব্যভিচার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ পাপ বৃত্তের বর্ণনা বক্ষ্যমাণ পবিত্র বিষয়ের সঙ্গে দেওয়া উচিত ছিল না। তবে যখন আমরা জাতীয় ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়াছি, তখন ভাল মন্দ বিচার করিয়া ফল কি? আমাদিগকে উভয়ই নিরপেক্ষভাবে লিখিয়া যাইতে হইবে। তবে সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিয়া রাখি, এ সকল স্বৈরাচার ভদ্রসম্প্রদায়ে কদাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

(১) স্ত্রীলোকদিগের এই—মাথায় 'ওড়না' এবং হাতে পাখা দেখিলে দেশীয় মহিলার কথা স্বতই স্মরণ হয়।

কথায় কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি ; পাঠক, ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে পুনরায় মূল কথার অবতারণা করা যাউক। পূর্ব্বে যে ভক্তিপূত নৃত্য-গীতের বর্ণনা কথিত হইয়াছে, সেই ভাবে চাক্‌মাদিগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পান ভোজন ও বিমল বিশ্রামাবসর ভিন্ন অহর্নিশই কাটাইয়া থাকে। অনন্তর পর (বিষু) দিন প্রত্যূষে স্নানাদিতে শুচি হইয়া যথাসাধ্য দান-ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হয়। অবস্থায় কুলাইলে এ সময়ে অনেকে "থামিংটং" বা অন্নমেরু, টাঙ্গোনোৎসর্গ প্রভৃতিও করিয়া থাক। এবং অনেকেই বিক্রয়ার্থে আনীত জীবিত মৎস্য ক্রয় করিয়া সমীপবর্ত্তী পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে বেলা আট নয় ঘটিকা যাবত কাটাইয়া, অবশেষে পূর্ব্বোক্তরূপ নৃত্য গীতের সহিত মহামুনি প্রদক্ষিণ এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রায় সকলে বিদায় হয়। সেই দিন দ্বিপ্রহরের পর মেলাস্থলে চাক্‌মা বা অপরাপর পাহাড়ীকেও কদাচিৎ লক্ষিত হয়। কিন্তু মেলা আরও প্রায় ৭।৮ দিন থাকে। কোন কোন বৎসর ইহার পরেও কর্ত্তৃপক্ষ হইতে ভাঙিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

বিষু সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া যাহা লিখিত হইল, তৎসমস্তই মহামুনি-সংপৃক্ত। তাহা ছাড়া বিষুপলক্ষে ইহাদের আরও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এ দিন জীবহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অন্নগ্রহণেরও বিধি নাই। কেবলমাত্র—বেতসাগ্র ও বন্যশাক-গুল্মাদি সহযোগে "পাচন" (শুক্তানি) খাইয়া দিনপাত করে। এতদ্ভিন্ন ভক্তিভরে "ছাদং-কারেক" (শাস্ত্রকথা) শ্রবণ এবং পরিপাটিরূপে "রড়ী" "ঠাকুর" প্রভৃতিকে খাওয়ান হয়।

বিশেষত যাহারা মেলায় যাইতে পারে না, তাহারা এই দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নদীতে গিয়া স্নান করে ; এবং যাহারা নদীতে যাইতে পারে না, অন্যেরা নদীর জল আনিয়া তাহা'দগকে অবগাহন করায়। এই নিমিত্ত 'আদমে' হৈ-চৈ পড়িয়া যায়—ছেলের দল এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বয়োবৃদ্ধগণকে স্নান করাইয়া থাকে। অনন্তর সকলে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন মাখে। বলা বাহুল্য, এইদিন অনেকে বাড়ীতে বসিয়াও অন্নমেরু, টাঙ্গোনোৎসর্গ প্রভৃতি দান ধর্ম্ম করে।

পূর্ণিমা ব্রত।—বৌদ্ধভাষায় আষাঢ়ের পূর্ণিমাকে "ওয়াছু" বলা হয়। এইদিন হইতে "ওয়া" অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ব্রত আরম্ভ হইয়া থাকে। তাই "ওয়াছু" বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অতি পবিত্র দিন। শ্রাবণের পূর্ণিমার নাম "ওয়াখংলাত্রে"। কথিত আছে, এই তিথিতে ইন্দ্র পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া "ছাখং" করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভাদ্রের পূর্ণিমাকে—"তচুলং লাত্রে", ও আশ্বিনের পূর্ণিমাকে "ওয়াগ্যা-

লাত্রে" বলা হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত দিনে "ওয়া" উঠিয়া যায়। এই কয় পূর্ণিমায় বিশেষতঃ "ওয়াছু" এবং "ওয়াগ্যাতে" ইহারা যথাসাধ্য ধর্ম্মচর্য্যা অর্থাৎ রড়ী-ভোজন, দান দক্ষিণাদি উৎসর্গ এবং শাস্ত্রকথা শ্রবণ প্রভৃতি করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন "মাঘী পূর্ণিমা" (তাবুং লাত্রে) কেও ইহারা পর্ব্বাহ স্বরূপে গণনা করে। শাস্ত্রমতে এই দিন বুদ্ধদেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষেও উপরোক্ত ব্রতচর্য্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত অপরাপর সকলে বৈশাখ এবং কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতেও পবিত্রভাবে ব্রতাচরণ করে; কিন্তু চাক্‌মাদিগের মধ্যে তাৎকালিক অনুষ্ঠান কচিৎ দেখা যায় মাত্র।

নবান্ন।—ইহা মূলতঃ হিন্দু সমাজেরই পর্ব্ব। নূতন ধান বাহির হইলে—সচরাচর কার্ত্তিক মাসেই, ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক নবান্ন একটি পবিত্র এবং সমীচীন ব্যবস্থা। বৎসরের প্রথম লব্ধ-জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ সর্ব্বাগ্র দেবতাদির উদ্দেশে দিয়া গ্রহণ করা বস্তুতই মনোহর দেখায়। আমরা সচরাচর কোন প্রিয়দ্রব্য লাভ করিলে, প্রথমে তাহা আমরা যাহাকে অধিতম ভালবাসি—তাহাকেই দিতে অভিলষিত হই। নবান্নও তাদৃশ অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে চাক্‌মাগণ নূতন চাউলদ্বারা (ছাগল বলিসহ) "চুঙ্‌লাং" অথবা (শূকর বলিতে) "মা-লক্ষ্মীমা"র পূজা করিয়া থাকে। এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মদ্য মাংসাদিসহকারে নবান্ন সজ্জিত থালা অতি পবিত্র ভাবে পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে এক ভিন্ন ঘরে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত স্থাপন করে। তাহাতে কোন কীট বা পতঙ্গ আকৃষ্ট হইলে তাহারা প্রেতাত্মায় গ্রহণ সিদ্ধ মনে করিয়া লয়। অনন্তর সেই প্রসাদ নদীজলে বিসর্জ্জন দিয়া আসে। এস্থলে ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, নবান্ন উপলক্ষে ভোজাড়ম্বর যথাসম্ভব অধিক হয়; এবং অপরিমিত সুরাপ্লাবনে অতিথি—অভ্যাগত ও প্রতিবেশিবর্গ পর্য্যন্ত ডুবিয়া রহে।

চুঙ্‌লাং।—এই সঙ্গে দেবী পরমেশ্বরীরও পূজা হইয়া থাকে। চাক্‌মাসমাজে ইহা একটি অতি পবিত্র ও অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান। বিশেষতঃ চুঙ্‌লাং না হইলে বিবাহ সিদ্ধই হয় না, স্ত্রী পুরুষের যে কেহ ইচ্ছা করিলে সেই বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে। মঘেরা বিবাহ, সন্তানজন্ম, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতিতে "চুমুংলে" নামধেয় গৃহদেবতার পূজা করে; তাহা হইতেই চাক্‌মাদিগের 'চুঙ্‌লাং' পূজার উদ্ভব সম্ভব। পরন্তু চাক্‌মাদিগের বিপদকালেও ইহা অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন সঙ্গতিপন্ন অনেকে প্রতি বৎসরেই ইহা করিয়া থাকে। ক্রিয়া পদ্ধতি যথা:—

পূর্ব্বদিন বিধিমতে ওঝাকে নিমন্ত্রণ করা হইলে, সে স্বপ্নে ভাবী চুঙ্লাঙের ফলাফল জানিতে পারে। পরদিন প্রাতে আসিয়া ওঝা দৈর্ঘ্যে সাতযোড়া ও প্রস্থে সাতযোড়া বাঁশের 'চ্যাচাড়ী' দ্বারা ছোট একখানি 'চাঙারী প্রস্তুত করে। তাহার এক পার্শ্বে একটি পাতার একখানি ক্ষুদ্র 'ছই' দেওয়া হয়। অন্য পার্শ্বে বাঁশের তিনখানি বাখারী' তেপায়া আকারে বসাইয়া তাহার মাথায় একটি পাতা জড়াইয়া দিয়া থাকে। ইহাদের সংস্কারমতে—এই ঘর খানি স্ত্রীলোকের এবং অপর 'ছই' খানি পুরুষের উদ্দেশে বিনির্ম্মিত হয়। পুরুষকে প্রায়শঃ বিদেশাদিতে যাইতে হয়। সুতরাং স্ত্রী-পুত্রাদির নিমিত্ত তাৎকালিক খাদ্য সংস্থান মানসে 'ছই'য়ের নিম্নে একটি ডিম্ব রক্ষা করে। ইহা ছাড়া, দুইটি ক্ষুদ্র ঝুড়ির একটিতে চাউল ও অপরটিতে ধান্য পরিপূর্ণ করতঃ যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষের দিকে রাখে, এবং ঝুড়ি দুইটির পার্শ্বে দুইটি মদ্যপূর্ণ পাত্রও স্থাপিত হয়। অতঃপর ওঝার "আগ চাওয়া" (১) হইয়া গেলে সচরাচর তিনটি কুকুট এবং বিবাহাদি কোন বিশেষ উপলক্ষ থাকিলে তৎসঙ্গে একটি শূকরও বলিদান করে। পরে মোরগের পদ, মস্তক ও হৃদপিণ্ড, এবং শূকরের মস্তক, শোণিত এবং সম্মুখ ও পশ্চাতের বিপরীত ক্রমে দুই খানি পদ সিদ্ধ করিয়া অগ্রভাগে কদলী-পত্রোপরি রাখিয়া দেয়। তদনন্তর ক্রিয়াকর্ত্তা সস্ত্রীক আসিয়া প্রণিপাত করে, এবং প্রাগুক্ত মদ্যপাত্রদ্বয় বিনিময় করিয়া থাকে। তখন দম্পতি পুনরায় 'দণ্ডবৎ' করে, ও ওঝা কৃতকর্ম্মের ভাবী শুভাশুভ পরীক্ষা করিয়া দেখে। যেমন, মোরগের অঙ্গুলীগুলিতে অত্যধিক ফাঁক থাকিলে ক্রিয়াকর্ত্রী অমিতব্যয়িনী হয়। নখে হৃৎপিণ্ড জড়াইয়া ধরিলে গৃহস্থের অমঙ্গল সূচনা করে। এইরূপে নানা পরীক্ষা আছে, অবশেষে চাউলগুলি ঢালিয়া আবার মাপিয়া দেখে। কথিত আছে, এই মাপে চাউল কম পড়িলে গৃহস্থি নিপাত এবং বেশী হইলে আরও বৃদ্ধি হইবে। ন্যূনাধিক্য না ঘটিলেও বিশেষ অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে। তন্নিমিত্ত যথাবিধি লক্ষীপূজা করিয়া কুকুট বলি প্রদান করে। চুঙলাং অনুষ্ঠানকালে

(১) "আগ"—পরীক্ষা, "চাওয়া"—দেখা। ওঝা দুইটি কাঁঠাল পাতা তদভাবে বাঁশপাতা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যস্থলে রাখিয়া আঙ্গুলিতে ভূতলে নিক্ষেপ করে। যদি পাতা দুইটিই চিৎ হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে—'হাসিতেছে।' অন্যথা দুইটিই উল্‌টিয়া পড়িলে বিরাগ ভাব সূচনা করে। কিন্তু ইহার কোনটিই সফলতাজ্ঞাপক নহে। দ্বিতীয় তৃতীয়বারের পরীক্ষাতেও যদি পাতা একটি চিৎ এবং আর একটি উপুড় করিয়া ফেলিতে না পারে, তাহা হইলে সেই পাতা দুইটি পরিবর্ত্তন করিয়া লয়।

চতুর্দ্দিকে সূত্র বেষ্টিত করা হয়। ব্রতসমাপনান্তে উক্ত সূত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফারাক্ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠানকারিগণের (পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীলোকের বাম) হস্তপ্রকোষ্ঠে জড়াইয়া দেওয়া হয়। পরিশেষে ইহাও উল্লেখ প্রয়োজন, সাধারণ "চণ্ডালাভে" 'চাঙারী' প্রভৃতির আবশ্যক হয় না, কেবল একটা ডিম্ব, তিনটী মোরগ এবং চাউল, মদ্য ইত্যাদি হইলেই চলে।

"মা-লক্ষ্মী-মা" (১) পূজা। -এই পূজার ওঝা প্রথমে দুইটী পাতা পূজাস্থানে রাখিয়া তদুপরি একটী "মারাই" (২) প্রোথিত করে। পরে ক্রিয়া-কর্ত্তা সস্ত্রীক সতণ্ডুলোদক-অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক প্রণিপাত করিলে, "আগ চাওয়া" হয়। অনন্তর একটী মোরগ বলি দিয়া, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া লয়, এবং একটী ঝুড়িতে পাতা পাতিয়া তদুপরি একখানি থালায় মাংসগুলি কিয়ৎকাল রাখিয়া দেয়। অবশেষে পুনরায় সতণ্ডুলোদক অর্ঘ্যদানে "সালাম" করিয়া মাংসে পরীক্ষা দেখে।—যদি মোরগের অঙ্গুলি গুলি উপর্য্যুপরি থাকে, তবে বিপদ নিশ্চয়। আর যদি একপার্শ্বস্থ অঙ্গুলী তিনটীর মধ্যে অপর পার্শ্বস্থ অঙ্গুলীটি আশ্রয় লয়, তাহা সৌভাগ্যের লক্ষণ।

"হোইয়া" বা "কালাইয়া" পূজা।—ইহা কালীপূজার প্রকার বিশেষ মাত্র। "হোইয়া" দ্বিবিধ—"পাঁচ পাতার" এবং "সাত পাতার হোইয়া"। "সাত পাতার হোইয়া"র অতিরিক্ত কার্য্য কেবল "হোইয়া সংস্থাপনের পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী খালে অন্তত একটি ছাগ বলিদান একান্ত প্রয়োজন। একটি সুদীর্ঘ বাঁশে কাপড় জড়াইয়া, তাহাতে "পাঁচ পাতার হোইয়া"র পাঁচখানি এবং "সাত পাতার হোইয়া"র সাতখানি (বাঁশের) মোটা 'বাখারী' আড়ভাবে থাক্ থাক্ করিয়া বাঁধিয়া দেয়; এবং প্রত্যেক 'বাতার' দুইপার্শ্বে দুইখানি করিয়া নুড়ন "খাদী" ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। পরে গৃহসম্মুখীন প্রাঙ্গণে একখণ্ড মোটা বাঁশ প্রোথিত করিয়া তন্মধ্যে একটি ডিম্ব রাখে এবং তাহার উপর উক্ত সুসজ্জিত

(১) লক্ষ্মী টংচঙ্গ্যাদিগেরও ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাহারা এই পূজায় একখানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করে। শিলাখণ্ডবিশেষকে লক্ষ্মী কল্পনা করিয়া গৃহমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক সপ্তগ্রন্থি বিশিষ্ট সাত গাছি সূতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া লয়। অনন্তর যথাবিধি পূজা করিয়া শূকর, মোরগ প্রভৃতি বলি দেয়। পরিশেষে সেই প্রসাদী মাংস সকলে আমোদের সহিত ভোজন করিয়া থাকে।

(২) "মারাই"।—বাঁশের বাখারী চাঁছিয়া একপ্রান্তে ঝুটি করা হইলে "মারাই" নামে অভিহিত হয়।

বাঁশ অর্থাৎ "হোইয়া" সংস্থাপন করে। ইহার পাদমূলে একটি বেদী প্রস্তুত করা হয়; এই সঙ্গে আনুষঙ্গিক যত দেবতার পূজা করিতে হইবে, বেদীতে ততখানি "মারাই" পুতিয়া যথানিয়মে পূজার্চ্চনার পর শূকর, মোরগ ইত্যাদি বলি প্রদান করিয়া থাকে। এই মাংসে নিমন্ত্রিতগণকে খাওয়ান হইয়া গেলে, অপরাহ্ণে ওঝা পূজাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া গৃহাভিমুখে তণ্ডুল বর্ষণ করিতে করিতে গৃহস্থকে "রাজার বাটায় পান খাও" "এক দানায় লক্ষ দানা (শস্য) পাও", "লোকে তোমাকে নমস্কার করিয়া সম্মান করুক" প্রভৃতিরূপে আশীর্বাদ করিতে থাকে। অনন্তর সমাগত সকলে "হোইয়া" কাঁধে লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী বাড়ী ফিরে, এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পর ওঝা "ঝিলা কুঁচোর" জলে সংস্কার করিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করে। ইতি পূজা পদ্ধতি শেষ। পরদিন প্রাতে কাপড়গুলি খসাইয়া বাঁশটি নদীজলে ভাসাইয়া দেয়।

শিবপূজা।—ইহাতে সাতটী মোরগ, একটি বড় শূকর, একটি শূকর শাবক এবং এক টাকার নানাবিধ ফলোপচার ও তৈল, ঘৃত ও মসল্লা ইত্যাদি প্রয়োজন। বাসগৃহের নিকটে ছোট একখানি "দান ঘর" উঠাইয়া, তন্মধ্যে আবার ক্ষুদ্রতর একখানি গৃহ রচনা করে। ইহার নাম "গোঁয়াই (গোঁসাই) ঘর"। তাহাতে একটি জলাধার অর্থাৎ ঘট স্থাপন করা হয়। রড়ী বৃহত্তর গৃহে বসিয়া পূজা সম্পাদন এবং পিষ্টক আহার করেন। পরদিন প্রাতে নিকটবর্ত্তী মাঠে অন্নবেদী সংগঠিত করিয়া পুনর্ব্বার পূজা ও "আগর তারা" পাঠ হয়। পূজাকালে অন্নোপরি কীট পতঙ্গাদি পতিত হইলে, সাফল্য সূচিত হইয়া থাকে। অতঃপর প্রতিবেশিগণকে লইয়া বিরাট ভোজ চলে। খাওয়ার সময় বৃদ্ধগণ ব্যঞ্জনাদির আস্বাদ তুলনায় পূজার শুভাশুভ ফল বিচার করে।

নবগ্রহ পূজা।—ইহা কথঞ্চিৎ হিন্দু-অনুকরণেই অনুষ্ঠিত হয়, তবে পূজাকার্য্য "ঠাকুরগণ" দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পূজার ঘট এবং উপচারাদিও যথানিয়মে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, হিন্দুদৈবজ্ঞগণোপদিষ্ট গ্রহ-শান্তিই এই পূজার উদ্দেশ্য।

কেরপূজা। (১)—"জুম" কাটার পর অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুন মাসে এবং "জুম" ক্ষেত্র শ্যামলাভায় ভূষিত হইয়া উঠিলে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে—বৎসরে দুইবার

(১) ত্রিপুরাদিগের মধ্যেও এই পূজা প্রচলিত আছে। পূজার সমসাময়িক কালে 'এক দিবা দুই রাত্রি (পার্ব্বত্য) ত্রিপুরাবাসিগণকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এমন কি নৃপতিও

এই পূজা করিবার নিয়ম। প্রতিবেশী সকলে মিলিয়া নদীকূলে পূজা করে। ইহাতে কুকুর পর্য্যন্ত বলি দেওয়া হয়। সৌভাগ্য সম্পদ লাভাশাতেও অনেকে "কেরপূজা" করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, এই পূজায় পূর্ব্বতন রাজগণ নরবলি প্রদান করিতেন। অধুনা "কেরপূজা" বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

সত্যপীরের সিন্নি।—মুসলমান সমাজের অবতার বিশেষ (১) হইলেও সত্যপীর বহুদিন হইতে "সত্যনারায়ণ" আখ্যায় হিন্দু সম্প্রদায়েরও পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুগণ নারায়ণ ঠাকুরের এত রকমবেরকমের সাজসজ্জায়ও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া ফকিরী আলখল্লা এবং 'নক্সমান দাড়ী-গোঁপ, গায় কাঁথা শিরে টোপ, হাতে আশা কাঁধে ঝোলা ঝুলি" (২)—ইত্যাদিতে সাজাইয়াছেন। বস্তুতঃ হিন্দু ও মুসলমানগণ বহুকাল যাবত একত্র বাস নিবন্ধন এই শ্রেণীর মিশ্র দেবতার পূজা উভয় সমাজেই প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন কবি ফকিররাম দাস উদার প্রাণে লিখিয়াছেন,—

"দেখ থাকে পুরাণ, কোরাণ থাকে দেখো।
জোই রাম রহিম দোনহি হোরে একো।"

ক্রমে ইহা চাকমাসমাজেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শনি মঙ্গলবারে কোন কোন স্থলে বা বারনির্ব্বিশেষে পাঁচপোয়া চাউলের আটা, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, কলা প্রভৃতি উপচারের সহিত পূজা স্থাপন করা হয়। অনন্তর প্রতিবেশিগণ উপস্থিত হইলে সকলে সভক্তি প্রণিপাত করে এবং উপচার রাশি একত্রে মাখিয়া "সিন্নি" প্রস্তুত করিয়া থাকে ইহাই সত্যপীরের প্রসাদ—গ্রহণে যাবতীয় আপদ বিপদ

গৃহের বাহির হইলে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাই তাঁহার অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন।' (রাজমালা—উপঃ ২৮ পৃষ্ঠা।)

(১) সত্যপীরের জীবনীবিষয়ক নানা জনশ্রুতি আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশের মতে—মনসুর হালক নামধেয় জনৈক বোগদাদ নগরবাসী সর্ব্বদা 'আমি সত্য' 'আমি সত্য' বলিতেন। তাঁহার এই ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্যে, কতিপয় গোঁড়া ঈশ্বর-নিবাসী কর্ত্তৃক অবশেষে তিনি নিহত হন। কিন্তু তখন তাঁহার রক্ত হইতেও সেই বাক্য উচ্চারিত হইতেছিল। এই কারণে তদীয় দেহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার মানসে জ্বালাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু সেই চিতাভস্ম হইতেও ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, 'আমি সত্য' 'আমি সত্য' ইত্যাদি। কবি রামেশ্বর সত্যপীরের ঊর্দ্ধু বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহার দুই পংক্তি যথা :—

"জওত সত্যপীর মেরা জওত সত্যপীর।
তেরা দুঃখ দূর করত ও হাম ফকীর॥"

(২) কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'সত্যপীরের কথা।'

দূরীভূত হয়। কোন বিশেষ কারণে প্রসাদ ভক্ষণে কাহারও নিষেধ থাকিলে, মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাখে।

ধর্ম্মকাম।—ইহার অন্য নাম "আদিপূজা"। বিজন অরণ্য-মধ্যে পূজার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে ভিন্ন ঘরে মুখবন্ধ পূর্ব্বক ভাত পাক করিয়া তথায় লইয়া যায়। বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে "ঠাকুর" তদভাবে "রড়ী" বা "লোথক" "আগর তারা" পাঠ করেন। অনন্তর পূজাস্থানে পাত্রোপরি একটি অন্নপিণ্ডকে মোচাগ্র আকারে বসাইয়া সূচাগ্র ভাগে অপর একটি ক্ষুদ্রতম পিণ্ড স্থাপন করা হয়। এবং চারিপার্শ্বে কলা, ইক্ষু, বাতাসা, মিষ্টান্ন, ব্যঞ্জন এবং পিষ্টক প্রভৃতি নানা উপচাররাশি সাজাইয়া দিয়া থাকে। সংস্কার আছে, যদি কোন-রূপে ক্ষুদ্রতর পিণ্ডটী স্খলিত হয়, তাহা হইলে ক্রিয়াকর্ত্তা নিশ্চয়ই অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, পিণ্ড সংস্থাপনের পর, বংশদণ্ড যোগে ৩।৪ খানি বস্ত্র (১) তাহার চতুষ্পার্শ্বে ধ্বজা দেওয়া হয়। তখন সস্ত্রীক ক্রিয়া কর্ত্তাও নবাগত সকলে সভক্তি প্রণিপাত করিয়া উঠিলে, পুরোহিত (ভিক্ষু, রড়ী বা লোথক) "দাসাপারামি তারা" পাঠ আরম্ভ করেন এবং ক্রিয়াকর্ত্তা ও তৎপরিবারস্থ সকলে চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই শাস্ত্র পাঠ প্রভাবে নাকি সেই অন্নপিণ্ড হইতে বাষ্প নির্গমন আরম্ভ হয়। অতঃপর ১৪টী কুক্কুট, একটি শূকর এবং একটি শূকরী বলিপ্রদান করে। তাহার কিয়ৎ পরে দৈব প্রেরিত একটি ঊর্ণনাভ আসিয়া অন্নপিণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে জাল বিস্তার করিয়া থাকে। এই মাকড়সা না আসিলে পূজাও সিদ্ধ হয় না। অপরতঃ যদি ঊর্ণনাভ পুরোহিতের পদাঙ্গুষ্ঠে সূতা জড়ায়, তবে তাঁহার আয়ুশেষ জানিবে। এইরূপে পূজা সমাপ্ত। পরে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া ঠাকুর, রড়ী ও লোথকদিগের ভোজন হইয়া গেলে, প্রধান পুরোহিত 'সাহসফুলু তারা' পাঠ করতঃ ক্রিয়া সঙ্গে করেন।

হাজার বাত্তি—ভাল কথায় সহস্র প্রদীপ। হিন্দুদিগের দীপান্বিতা ও এই এই 'হাজার বাত্তি'তে বহুল সাদৃশ্য আছে, দূর হইতে দেখিলে এক বলিয়াই মনে আসে। বস্তুতঃ ক্রিয়াস্থলের গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণই বিচিত্র! বাঁশ ও বাখারী দ্বারা এমন কারুকার্য্য প্রকাশ করা হয় যে, দেখিলে বিস্ময় লাগে। এরূপ সরল অথচ সুন্দর শিল্প বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। চারিদিকে চারিখানি সুগঠিত

(১) এই বস্ত্র প্রস্তুত প্রক্রিয়াও বিধিবদ্ধ আছে। একবার মাত্র বিবাহিতা স্ত্রীলোককে মুখবন্ধ করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিতে হয়।

দ্বার। ভিতরে চারিকোণায় এবং মধ্যস্থলে মঞ্চসংবলিত পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্বজ, তথায়ও প্রদীপ স্থাপনের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে। এতদ্ভিন্ন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীবেষ্টনে কদলীবৃক্ষ এবং সারি সারি বাতি সুসজ্জিত হয়। ধ্বজাদণ্ডেও বাতি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যাসমাগম মাত্রই ক্রিয়াস্থল উজ্জলিত হইয়া উঠে। বাতি সংখ্যা কেবল হাজার নহে, সহজে গুণিয়া লইবারও সাধ্য থাকে না।

সর্ব্বপ্রথমে একখানি "টাঙ্গোন" উৎসৃষ্ট হয়। তদনন্তর অনুষ্ঠাতা সহধর্ম্মিণী এবং নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনাদির সহিত সাতবার ক্রিয়াস্থল প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দ্বার সমীপে পূর্ব্বমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের মাথায় "থবং," আর পুরুষেরা গলবস্ত্র; পরন্তু সকলেই ভূমিতলে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। উৎসর্গকালে ক্রিয়াস্থল ও সমবেত সকলকে বেষ্টন করিয়া সাতগুণ সূতা দেওয়া হয়। ইহাদের বিশ্বাসমতে যাহারা এই সূত্রলহরীর বাহিরে থাকে, ক্রিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেও তাহারা কোন ফলভাগী হইবে না। পশ্চিমদ্বারের পার্শে একটি গর্ত্ত করিয়া জলপূর্ণকরতঃ ক্ষুদ্রতম সংস্করণে সরোবরে গঠিত করে। "ঠাকুর" বা "রূড়ী" তন্তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখে তালবৃন্ত ধারণ পূর্ব্বক (১) মন্ত্র ও "তারা" পাঠ আরম্ভ করেন। উৎসর্গ সম্পাদিত হইলে কর্ত্তা এবং তদীয় গৃহিণী উক্ত সরোবরে যথাসাধ্য দক্ষিণা প্রক্ষেপ করে। তখন উপস্থিত অপরাপর সকলেও স্ব স্ব ভক্তি ও সামর্থানুরূপ দক্ষিণা তাহাতে দিয়া থাকে।

থামিং টং—বার্ম্মিজ ভাষায়—"থামিং" অর্থ অন্ন, "টং" অর্থ পর্ব্বত, অর্থাৎ অন্নপর্ব্বত। কেহ কেহ ইহাকে বিশুদ্ধ বাংলাতে 'অন্নমেরু'ও বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ 'থামিং টং" নাম দেখিয়াই বুঝা যায় যে, ইহা ব্রহ্মবাসীদের হইতে অনুকৃত। হরিদ্রা মিশ্রিত অন্নদ্বারা চতুষ্কোণাকারে কেহ সপ্ততল কেহ বা পঞ্চতলে পর্ব্বত সাজাইয়া সর্ব্বোপরি একটি অন্নশৃঙ্গে স্থাপন করে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক কোণায়ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্নশৈল স্থাপিত হয়। এবং তৎসঙ্গে ঘৃত, চিনি, সিন্দুর, চন্দন, পান, সুপারি, পেপে, নারিকেল প্রভৃতি নানা উপচার দিয়া থাকে। এই অন্নমেরু "ঠাকুর" এবং "রূড়ীদিগকে" উৎসর্গ করা হয়, এবং সঙ্গে বিশিষ্ট ভোজও চলিয়া

(১) বৌদ্ধমতানুসারে যাহাতে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন না ঘটে, তজ্জন্য ভিক্ষু বা শ্রমণগণ সম্মুখে তালবৃন্ত ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে।

থাকে। কোন কোন পরিবারে এককালে দুইটী "থাম্নিং টং" উৎসৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এক "থাম্নিং টং"এর ভাতগুত্তিতে হলুদ মিশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দশ পনর দিনেও "থাম্নিং টং"এর উৎসৃষ্ট অন্ন শৃগাল-কুকুরে পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। আশ্বিনের পূর্ণিমা অর্থাৎ "ওয়াগ্যা"ই "থাম্নিংটং" উৎসর্গের প্রকৃষ্ট সময়। এতদ্ভিন্ন বিযু এবং বৈশাখ ও মাঘী পূর্ণিমায়ও ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

চক্রব্যূহ—ইহাও বৌদ্ধব্রত। বেড়াদ্বারা বিরাট ব্যূহ গঠিত হয়, তাহাতে দুইটী মাত্র দ্বার রাখা হয়। দর্শক প্রবেশ করিলে সহজে পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না; দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শুভদিনে বিশেষতঃ বৈশাখ, আষাঢ় বা আশ্বিনের পূর্ণিমায় "রড়ী" "ঠাকুর" প্রভৃতিকে দান দক্ষিণাদি দিয়া এই ব্যূহ উৎসৃষ্ট হয়। এই সঙ্গে ছাদং-ফারেক শ্রবণ এবং ভোজাদিও চলিয়া থাকে। মধ্যস্থলে একখানি মঞ্চ করে, তাহাতে রড়ী প্রভৃতি উপবেশন করেন; আর সকলে ব্যূহভ্রমণ ছলে তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুণ্যোপার্জ্জন করে। পরন্তু তাহাদের এই প্রদক্ষিণও অনেকটা "মহামুনি মন্দির" প্রদক্ষিণের ন্যায়। অপূর্ব্ব কুইধ্বনি সহকারে বিভ্রমবিহ্বল নৃত্য আগন্তুকের পক্ষে অতিশয় আমোদপ্রদ। বিগত ২৪ শে জানুয়ারী যখন 'পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে'র লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর রাঙামাটিতে শুভাগমন করেন, তখন তিনিও এই দৃশ্য দেখিয়া অতীব বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

টাঙ্গোনোৎসর্গ—"টাঙ্গোন" অর্থ ধ্বজা। টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় বলিয়াই ধ্বজা নামান্তরে "টাঙ্গোন" আখ্যা পাইয়াছে। সোয়া কি দেড়হাত পরিমিত পরিসর বিশিষ্ট ১০।১২ হাত দীর্ঘ নূতন ধবলবস্ত্রে নানা ফুল 'লতা' কাটিয়া এক প্রান্তে বাঁশের 'চ্যাচাড়ী' নির্ম্মিত ত্রিভুজাকৃতি একখানি "চ্যাজ" বদ্ধ করত অপর প্রান্ত একটি সুদীর্ঘ বাঁশে ঝুলাইয়া দেয়। কথিত আছে, এই ধ্বজার বাতাসে যত ধূলিকণা স্থানান্তরিত হয়, প্রতিষ্ঠাতার তত্তবৎসর স্বর্গবাস ঘটে। পূজাপার্ব্বণের সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধে, বিযু, ওয়াছু প্রভৃতি পর্ব্বে এবং শিত্তোৎসর্গ, হাজার বাতি, থাম্নিং টং, চক্রব্যূহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উক্ত 'টাঙ্গোন' উৎসর্গীকৃত হয়। উৎসর্গকালে "রড়ী", "ঠাকুর" প্রভৃতিকে পরিপাটি ভোজন এবং দক্ষিণা দান আবশ্যক। আবার একপ্রকারের "ফুল টাঙ্গোন" প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা যুবকদের ক্রীড়া বিশেষ মাত্র, ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাতে কাপড়ের পরিবর্ত্তে কেবলই পুষ্প মাল্য গ্রথিত হয়; দূর হইতে দেখিতে বড়ই মনোরম দেখায়।

গাভীদান ও ঘাটছাড়া।

এতদ্ভিন্ন গাভীদান ও 'পারঘাটায়' শুল্কমুক্তি ইত্যাদিও ধর্ম্মার্জ্জন-মানসে অনুষ্ঠিত হয়। 'গাভীদান' শব্দেই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বিশ্লেষিত হইতেছে। শুভদিনে বা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে "ঠাকুর" কি "রত্নীকে" দক্ষিণাদির সহিত পয়স্বতী গাভী সম্প্রদান করা হয়। আর পাপমুক্তির কামনাতেই "ঘাটছাড়া" অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য 'পারঘাটা'র শুল্ক বিমুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অবশ্য তন্নিমিত্ত 'পাটনী'কে পূর্ব্বে দাবী-অনুরূপ প্রাপ্য দিয়া বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

এই সমুদয় ব্যতিরেকে চাক্‌মাসম্প্রদায়ে আরও অনেক ক্রিয়ানুষ্ঠান আছে, তৎসমুদয় পারিবারিক কার্য্যে বা রোগ কি বিপদ্‌মুক্তি কারণে করা হইয়া থাকে। ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তৎসমস্ত এখানে উল্লিখিত হইল না, যথাস্থানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সমাজ-বিধি এবং স্ত্রী-আচার।

ধর্ম্মের শাসন ছাড়াও সমাজের এমন কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে সমাজরক্ষার নিমিত্ত যাহা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তৎসমুদয়কে দশকর্ম্মাদির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না বটে, তথাপি অবশ্য প্রতিপাল্য জ্ঞানে সকলকেই তত্তৎসমাজের বিধিব্যবস্থাগুলি অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। যে সমাজের তাদৃশ বন্ধন নাই, তাহা কখনই সমাজ-পদবাচ্য হইতে পারে না। সেই সমুদয় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলে, সমাজ নিশ্চয় ধ্বংসাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং সমাজের বিধিব্যবস্থাগুলির মস্তকে যাহারা পদাঘাত করিতে চাহে, তাহারা যে কেবল সমাজদ্রোহী তাহা নহে, সমস্ত জাতির অধঃপতনের মূলেও তাহারা ন্যায়তঃ দায়ী। আবার যে সকল ব্যক্তি সমাজ বিশেষের ব্যবস্থিত রীতিনীতির প্রতি সমালোচনার কশাঘাত প্রয়োগ করেন

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(দাদা), বয়ঃকনিষ্ঠ যুবক "গাভুর" (১) এবং শিশুকে "চিকণ" (খোকা) বলিয়া আহ্বান করা হয়। বিশেষতঃ 'ডাঙ্গু' কথাটি এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত যে, বাঙ্গালীগণও ইহাদিগকে সাধারণ সম্বোধনে 'ডাঙ্গু' বলিয়া থাকে। এই সকল ছাড়া ইহাদের সমাজে অতিথি অভ্যাগত সেবা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ঘরে অভ্যাগত উপস্থিত হইবামাত্র প্রথমে পাদপ্রক্ষালণের উদ্যোগ হয়। তজ্জন্য "সাঁকো" সন্নিধানে ইজরোপরি কলসী পূর্ণ জল এবং একটি ঘটী কি মেটে "কোন্ডি" রক্ষিত থাকে। অতঃপর পান তামাকাদি এবং যদি বিশেষরূপে জানা থাকে যে আগন্তুক পানেও অভ্যস্ত, তাহা হইলে এই সঙ্গে নানাবিধ মদ্যও প্রদত্ত হয়। বিবাহাদি শুভ-কর্ম্মের নিমন্ত্রণকালে—পান, সুপারি, লবঙ্গ প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়া থাকে। অধুনা কোন কোন স্থলে এ সকলের পরিবর্ত্তে পরিবার প্রতি এক একটি পয়সা দ্বারা 'মানাইয়া' নিমন্ত্রণ করিতে দেখা যায়। নিমন্ত্রণে বংশও মর্য্যাদা বিশেষেই বসিবার স্থল নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। অন্যপক্ষে সম্পর্কের সম্মানও গণনা করা হয়। সমশ্রেণীর দুই তিন জন মিলিয়া একত্রে আহার করিতেও ইহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। বিশেষতঃ 'চিকণ' গুলি বয়োজ্যেষ্ঠের সহিত খাইতে কোন আপত্তিই হইতে পারে না। অধিক কি, দম্পতির একত্র ভোজনও সাধারণ পরিবারে বিরল নহে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা প্রায় স্বামীর পূর্ব্বে খায় না। তবে কিনা যখন তাহাদিগকে কার্য্যে বাহির হইতে হয়, অথচ স্বামী ঘরে থাকে না, তখন তাহারা বাধ্য হইয়া অভুক্ত স্বামীকে ফেলিয়া খায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বে স্বামীর নিমিত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া "মোচা" (পুটুলী) বাঁধিয়া রাখে। ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রতি ইহাদের একটী বিশেষ সাবধানতা দেখা যায় যে, বিড়ালের মুখস্পর্শ ঘটিলে তাহা বিষবৎ পরিবর্জ্জন করে।

ভোজন প্রথা।

কেশ ভূষণে ইহারা নিতান্ত অসৌভাগ্য হইলেও চুলের প্রতি ইহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায়। অনেক পুরুষ বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকেরা চুল রক্ষা করে (২); অবশ্য শিক্ষিতগণ এই ব্যবস্থাধীন নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর সন্তান মাত্রেরই

---

(১) পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থলে অদ্যাপি "গাভুর" শব্দটী যুবক বা বলশালী, কোথায় বা মজুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) পুরুষদিগের চুল রক্ষা পুরাকালেও বিরল ছিল না—

"পলায় রামের সৈন্য নাহি বাঁধে কেশ"—কৃত্তিবাস।

"পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল"—বিজয় গুপ্ত।

চুল ফেলিয়া দিবার বিধি আছে বটে, কিন্তু মৃতবৎসা নারীর বহুযত্নাদি করিবার পর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার চুল একগুচ্ছ কোন দেবতা উদ্দেশে রাখিয়া দেওয়া হয়। পরে পুত্র বয়স্ক হইলে উদ্দিষ্ট দেবতার মানৎ দান করিয়া সেই চুল ফেলিয়া দেয়।

চুলে যত্ন।

এতদ্ভিন্ন পিতা মাতার মৃত্যুতে 'হাড় ভাসাইবার' পরে মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের মহিলাগণ চুল পেছন দিকেই আঁচড়ায়। সিঁতি কাটে না সত্য, কিন্তু পশ্চাদ্দিকে খোঁপা বাঁধিয়া থাকে। এবং বালিকারা তাহা মনোহর বনফুলে সুভূষিত করে। বস্তুতঃ জানিনা কেন, সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েই কেশের প্রতি কামিনীদিগের আদর রহিয়াছে। চাক্‌মা সম্প্রদায়ে সুদীর্ঘ কেশ রাশি মণ্ডিত কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই, চুল ভিজিবার ভয়ে ডুব দিয়া স্নান করে না; ছয় সাত দিন অন্তর সুবিধা মত সময়ে ক্ষারক ভস্ম বা লতা বিশেষের নির্য্যাস দ্বারা চুল পরিষ্কার করিয়া লয়।

ইহাদের চুম্বন-প্রথায়ও অভিনবত্ব আছে। অধরে অধর মিশাইয়া শীৎকৃতির পরিবর্ত্তে গণ্ডস্থলে মুখ স্পর্শ করিয়া জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। ইহা কতক পরিমাণে আমাদের শিরো-ঘ্রাণের অনুকৃতি হইবে।

চুম্বন বিধি।

পার্ব্বতীয় জাতির অনূঢ় যুবকগণ রাত্রিকালে প্রায়ই বাড়ীতে থাকে না; গ্রামের সকলে মিলিয়া "ক্যাং" বা অপর কোন গৃহে রজনী যাপন করে। তাহাতে সেখানে তাহাদের যথেচ্ছ আমোদ প্রমোদ করিবার সুবিধা ঘটে। তাহাদিগের মধ্যে একজন দলপতি থাকে; দলের সকলেই তদীয় আদেশ পালনে বাধ্য। পরন্তু দলভুক্ত দিগের চরিত্র রক্ষার নিমিত্তও তাহার দায়িত্ব থাকে, তজ্জন্য সে সকলেরই চরিত্রের উপর সুতীক্ষ্ণ নজর রাখে। মিঃ হাণ্টারের লেখায় দেখা যায়, সাঁওতাল দিগের মধ্যেও এতাদৃশী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

অনূঢ় সমিতি।

Annals of Rural Bengal, P—217.

ছোটনাগপুরের কোলদিগের বর্ণনাতেও কর্ণেল ডেল্টন লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রতি গ্রামেই অবিবাহিত যুবকদিগের রাত্রিবাসের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র গৃহ থাকে। তাহার সম্মুখে বিস্তীর্ণ খোলা জায়গা রাখা হয়; সেখানে তাহারা নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকে। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ যুবকগণ কনিষ্ঠদিগের উপর আধিপত্য করে।" অত্রত্য টংচঙ্গ্যা অর্থাৎ দৈংনাক সম্প্রদায়েও ঈদৃশী প্রথা সাধারণ, কিন্তু চাক্‌মা-দিগের মধ্য হইতে ইহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। রাত্রিতে "আদমের"

অবিবাহিত যুবকদল "ব্যাং" বা কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহে থাকে বটে, কিন্তু কোন দলপতির ব্যবস্থা এক্ষণে আর নাই।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্বজাতীয় অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের অবাধ-মিলনে প্রায় কেহই হস্তক্ষেপ করে না। পিতা মাতা বা অপরাপর অভিভাবকগণ তাহাদের আমোদ-প্রমোদে বাধা দান অসঙ্গত মনে করে এবং তাহা "গাভুর মিলায় বিযুক্তি" অর্থাৎ যুবক যুবতীর আমোদ জ্ঞানে নিজেরা সরিয়া যায়। কোন কোন অভিভাবককে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি "বয়সের সময় আমোদ আহ্লাদ করিবে তাহাতে আপত্তি কি? তখন আমরাও কি করি নাই?" কোন কোন কন্যার পিতা এবংবিধ সংমিলনে প্রশ্রয় দিয়া দুহিতার পাণিপ্রার্থী যুবকগণকে খাটাইয়া লয়। একবার জনৈক শিক্ষক কোন বালককে এরূপ অবৈধ সঙ্গমের নিমিত্ত শাস্তি দিয়াছিলেন। তাহাতে বালিকার অন্যতম অভিভাবক অতিশয় দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন "মাষ্টারবাবু, শুনিলাম আপনি নাকি × × কে শাস্তি দিয়াছেন, কিন্তু দেখুন,—সে এমন অন্যায় কাজ ত কিছুই করে নাই।" তখন শিক্ষক মহাশয় গতিক বুঝিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "কাজ অবশ্য অন্যায় না হইলেও তাহাদের বয়সোচিত হয় নাই।" সত্য বলিতে কি, এই শ্রেণীতে বিবাহের পূর্ব্বে অনেক যুবতীরই এক বা ততোধিক প্রণয়ী থাকে এবং অধিকাংশ স্থলে এই ঘনিষ্ঠতা হইতেই বিবাহ ঘটিয়া যায়। কিন্তু বিবাহের পর আর কাহারও চরিত্র দোষ শুনা যায় না; এবং ইহাও বিশেষ প্রশংসার কথা, বিজাতীয়ের সহিত উপগতা চাকমা রমণী এত বিরল যে, নাই ধরিয়া লওয়া যায়। সহস্র প্রলোভনেও নাকি তাহারা বিজাতীয়ের প্রার্থনা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে, ইহাও কম প্রশংসনীয় নহে!

অবাধ মিলন।

স্বজাতীয় হইয়াও যুবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি কেহ তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, তবে সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের ৬০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। এতদতিরিক্ত যুবতীর পিতৃগ্রামবাসী ছেলেদের হইতে 'উত্তম-মধ্যম' 'অর্দ্ধচন্দ্র' প্রভৃতি 'উপরি' লাভও আছে। আর কোন ব্যক্তি সম্মতি সহকারেও অন্যের বিবাহিতা পত্নী লইয়া পলায়ন করিলে, তাহাকে ৪০ টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমাণা এবং প্রণয়িনীর মূল্য স্বরূপ তৎস্বামীকে তাহার বিবাহকালীন যাবতীয় ব্যয় দিতে হয়; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়িনীর উপর খাস দখলের অধিকারও লাভ করে। জেঠী, খুড়ী প্রভৃতি কতিপয় নিকটতম সম্পর্কের মধ্যে, অবৈধ প্রণয় সংঘটিত এবং

ব্যভিচারে দণ্ড।

প্রকাশিত হইলে উভয়েরই ৫০ টাকা অর্থদণ্ড ও শারীরিক শাস্তি বিহিত হয়। যদি চাকমা রমণীর সহিত কোনও বিজাতীয় পুরুষের গুপ্ত প্রণয়ের প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অপরাধী গ্রামের সকলকে একটি শূকর দিয়া পরিপাটিরূপে নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে বাধ্য হইয়া থাকে। নিমন্ত্রণের লোভে অনেকেই তাদৃশ ঘটনা আবিষ্কার করিতে সতর্ক দৃষ্টি রাখে; পক্ষান্তরে বিজাতীয় দুশ্চরিত্রগণও "শূকর দেওয়া" রূপ লজ্জাজনক শাস্তির ভয়ে তেমন পাপ কামনা মন হইতে দূর করে।

বিচার।

যে কোন অভিযোগ প্রথমে "হেড্‌ম্যান" সমীপে উপস্থিত হয়। তিনি স্বীয় ক্ষমতাতীত বিচার-ভার রাঙ্গাবাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজাও আবার আপন ক্ষমতা বহির্ভূত বুঝিলে তাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের কাছে পাঠাইয়া থাকেন। সালিসী বিচারে যদি কোনও অভিযোগের প্রকৃত দোষী নির্ণয় দুরূহ হয়, তখন এক অভিনব প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। একসের পরিমিত চাউল পরিপূর্ণ একটী পাত্র "ক্যং" মধ্যে পবিত্র বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে একরাত্রি রাখিয়া দেয়। পরদিন অতি প্রত্যূষে সকলে সমবেত হইয়া সন্দেহযুক্ত অপরাধীকে সেই পাত্র হইতে একমুষ্টি চাউল চিবাইতে দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি নির্দ্দোষ হইলে ইহাতে তাহার কোন কষ্ট হয় না; কিন্তু যদি দোষী হয়,—তবে যে সে কেবল চিবাইতে অসমর্থ হইবে এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে নাকি তাহার রক্তবমন আরম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রমাণিত অপরাধীর প্রতি শাস্তি-পরিমাণ গুরুতর হয়। দোষী অর্থদণ্ড দিতে অসমর্থ হইলে প্রাচীন নিয়মানুযায়ী নিজের মজুরী হিসাবে নির্দ্ধারিত কালের নিমিত্ত বিচারকের দাসত্ব গ্রহণ করে।

দাম্পত্য বিচ্ছেদ (Divorce)।

অবশ্য বিরল হইলেও বিবাহবন্ধনচ্ছেদ এই সমাজে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে। সাধারণতঃ ইহাদের পুরুষেরা কিঞ্চিৎ অধিকতর কামাতুর, সুতরাং তাহারাই সর্ব্বংসহব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সহিষ্ণুতার মাত্রা অতিক্রম করিলে, ইহারা প্রণয়িনীর প্রতি শাস্তিবিধান করিতেও ছাড়ে না বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার গলিয়া যায়! ফল কথা, ভাষায় যাহাকে স্ত্রৈণত্ব বলে, ইহাদের সমীপে তাহা নিন্দনীয় নহে। তথাপি প্রায়শঃ মহিলাগণ কোন কারণে স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ঘটিলে, অমনি তাহার সংসর্গ-বিমুক্তির নিমিত্ত হেড্‌ম্যান সমীপে প্রার্থনা উপস্থিত করে। এমন কি, স্বামী যদি মনোমত রসজ্ঞ না হয়, তন্নিমিত্ত কোন কোন ভামিনী স্বামীর উপর পুরুষত্ব-হীনতা আরোপ করিয়া বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ

প্রার্থনা করে। হেড্‌ম্যান ঈদৃশ বিচারে গ্রামের দশ বয়োবৃদ্ধের সহিত পরামর্শ করিয়া নিষ্পত্তি করেন। বিচারকালে কোন কোন স্থলে তাহাদের দাম্পত্যপ্রণয়ের গভীরতাও পরীক্ষিত হয়। কাপ্তেন লুইন এবংবিধ রহস্যময় একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা—"একদা সন্ধ্যার সময় কয়েকজন পল্লীবাসিনীর সহিত কোন রমণী জল আনিতে নদীতে গিয়াছিল। এমন সময় তাহার স্বামী অপর যুবতীগণকে পরিচিত জনৈক যুবকের সহিত হাসি-তামাসা করিতে করিতে তৎপ্রাত্ত জল ছিঁটিতে দেখিতে পায়। সে ইহাতে নিজ প্রণয়িনীরও চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়া তখনই সেই যুবককে নানা ভৎর্সনা এবং সকলেরই সম্মুখে স্ত্রীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। তাহাতে যুবতী অতিশয় মর্ম্মাহতা হইয়া এই স্বামী পরিত্যাগের নিমিত্ত হেড্‌ম্যানের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে। হেড্‌ম্যান ও গ্রামের অপর বৃদ্ধগণ প্রথমে নানারূপে তাহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। অবশেষে তাহারা পরামর্শ করিয়া সেই শীতকালে বিনা শয্যায় দম্পতিকে এক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রাতে আসিয়া দেখিলেন, যুবতী তথাপি বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের প্রার্থনা করিতেছে। তজ্জন্য তাঁহারা যুবতীকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার ৩০ টাকা অর্থদণ্ড করতঃ বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ অনুমোদন করেন।" (১) এইরূপে যাহার দোষে দাম্পত্য-প্রণয় ছিন্ন হয়, তাহাকেই দণ্ডভোগ করিতে হইয়া থাকে। পুরুষেরাও এ কার্য্যে প্রার্থী হয় না, এমন নহে; তবে সচরাচর খুব কম এবং তাহা সহজেই মীমাংসিত হইয়া যায়। হেড্‌ম্যান যে সমুদয় বিচার গুরুতর উপলব্ধি করেন; তৎসমস্ত রাজ-সরকারে পাঠাইয়া থাকেন। এখানে এই বিচারের নিমিত্ত একখানি ঘর আছে, তাহাতে দম্পতিকে নির্দ্দিষ্ট কয়েক মাসের নিমিত্ত থাকিবার আদেশ হয়। হয়তঃ ইহাতেই পরস্পরে মিলিয়া যায়, অন্যথা যথাবিধি বিচার মীমাংসা হইয়া থাকে।

(১) এসম্বন্ধে খাসিয়াদিগের এক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যবস্থা আছে। তাহাদের দাম্পত্য বিচ্ছেদের সময় উভয় পক্ষের আত্মীয় বান্ধবেরা উপস্থিত থাকা আবশ্যক। স্ত্রী স্বামীকে একটী পয়সা দেয়, স্বামী তাহা নিজ হইতে আর এক পয়সা সহ স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুনঃ দুই পয়সাই স্বামীকে প্রত্যর্পণ করে, সে উহা ফেলিয়া দেয়। তখন এক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে সমগ্র পল্লিতে তাহাদের দাম্পত্য বিচ্ছেদ সংবাদ ঘোষণা করিয়া থাকে।

চাকমাসমাজে অবরোধপ্রথা অনেক পরিমাণে শিথিল হইলেও ভাগিনেয় বধূ এবং ভ্রাতৃবধূ সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে বিধি-নিষিদ্ধ। বোধ হয় এই সমুদয় হিন্দু-সমাজেরই সংসর্গজাত ফল। কিন্তু আবার সন্দেহ হয় যে, ভ্রাতৃবধূকে স্পর্শ করা যখন প্রায় যাবতীয় পার্ব্বত্য জাতির মধ্যেই বারিত রহিয়াছে, এমন কি—সর্ব্ববাহিসম্মত আদিম বর্ব্বর সাঁওতালদিগের ভিতরেও এই বিধি অতি সাবধানে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তখন ইহাতে হিন্দুসমাজের কতদূর দাবী আছে? আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এইযে, ইহাদের মধ্যে মেয়েদের "পিঁধন" কাপড় পুরুষেরা পারতপক্ষে ছোঁয় না।

স্পর্শনবিধি।

বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুদর্শন ইহাদিগের মধ্যে নিন্দা বা লজ্জাকর নহে। তবে কিনা এই রজস্বলাকালে যতদিন "গায়েন পানি ভাঙে" অর্থাৎ রক্তস্রাব থাকে—সচরাচর তিনদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অশুচি ধরা হয়। সাধারণ স্পর্শদোষ ধরা না হইলেও অপরের ঘরে কি ধর্ম্মকর্ম্মে যোগদান করিতে পারা যায় না। এবং এই সময়ে প্রায় পরিবারে তাহাদিগকে পাক করিতেও দেওয়া হয় না।

"গায়ের পানিভাঙন।"

গর্ভিনী ইচ্ছামত খাইতে পায়, তাহার ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা এক ঝুড়ি শুষ্ক মৃত্তিকা আনিয়া প্রসূতির শয্যা-পার্শ্বে রাখে, এবং তদুপরি অগ্নি প্রজ্বলিত করে। পাঁচ দিনের মধ্যে এই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দেয় না। অতঃপর মাটিও ফেলিয়া দেওয়া হয়। যদি প্রসবের সময় সবিশেষ কষ্ট হয়, একটী ছাগল প্রসূতির মাথা "নিছিয়া" নদীতে বলি প্রদত্ত হয়, ইহারই নাম গঙ্গাপূজা।

গঙ্গাপূজা।

প্রসবের দিন হইতে ১৫ দিন যাবৎ প্রসূতি অশুচি থাকে। রজস্বলাকালের ন্যায় তাহারা এই কয়দিন সংসারের সমুদায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। পরন্তু কেবল প্রসূতি নহে, সন্তানের পিতাও এই পনর দিন এবং "ওঝা" (ধাত্রী) নবজাত সন্তানের নাভী স্খলিত হওয়া পর্য্যন্ত অশৌচ ভোগ করে। এই সময়ে তাহারা কেহ ঘরে বা কাহারও পূজাগৃহে উঠিতে পারে না। অশৌচান্তে সকলে "ঘিলা-কুচোই-সোনারূপা"র জল দিয়া পবিত্র হয়। বলিতে ভুলিয়াছি, রজস্বলা কি প্রসবের অনধিক পরেই স্নানের ব্যবস্থা

জাতাশৌচ ও প্রসবে ব্যবস্থা।

আছে (১)। সচরাচর প্রসবের পরদিন প্রসূতি "কানি বেনা" (২) লইয়া নিকটবর্ত্তী খালে স্নান করিতে যায়। সংস্কার আছে, খালে গিয়া স্নান না করিলে প্রসূতির স্তন্ত হয় না। তদ্ভিন্ন প্রসূতির খাদ্য পানীয়ের প্রতি কোন বাধা ব্যতিক্রম থাকে না। কানীন সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা ঘটিলে, তৎপ্রসবের নিমিত্ত পৃথক "ছেলেফুটানী ঘর" আবশ্যক। কারণ সেই গৃহ আর কোনও কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। অবশ্য ব্যভিচারী ব্যক্তির স্কন্ধেই সেই ব্যয়ভার পড়িয়া থাকে।

সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত ইহাদিগের অশৌচ গ্রহণ বিধি। গোষ্ঠির ভিতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মাত্রেই অশৌচ পালন করে। এই সময়ে ইহারা নিরামিষ ভোজন এবং বিলাস বাসনাদি ছাড়িয়া কাল কাটায়; পতি বিয়োগ-বিধুরাগণ কোন অলঙ্কারই ধারণ করে না। যুবতী বিধবাগণ স্বামীর অশৌচান্তে পুনরায় অলঙ্কার সজ্জা করে বটে; কিন্তু অনেকেই "হাঁচুলী" (গলভূষণ) আয়তি চিহ্ন জ্ঞান করিয়া ধারণে বিমুখ হয়। বৃদ্ধা বিধবাদিগের কোন গহনাই থাকে না এবং পরিধানেও কেহ কেহ হিন্দু বিধবার ন্যায় থানের কাপড় ব্যবহার করে।

অশৌচ বিধি।

ইতিপূর্ব্বে আমরা "ঘিলা কুচোইর পানি"র কথা নানা অনুষ্ঠান বর্ণনা প্রসঙ্গে বারম্বার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। অশুচিত্ব দূরকরিবার ইহাই একমাত্র উপকরণ। ঘিলা ও কুঁচবাটা, জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সোণারূপা ধৌত জল এবং কিঞ্চিৎ মদ্য ও প্রদান করা হয়। ইহাই "ঘিলা কুচোইর পানি" আখ্যায় কথিত হইয়া থাকে। এই জলে দক্ষিণ জুল্‌পি বা মস্তক বিধৌত করিলেই পবিত্রতা সাধিত হইয়া যায়। এইরূপে বিশুদ্ধ হওয়াকে "বুরপারন" বলে। নদী তীরেই এইকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অনুষ্ঠানান্তর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পশ্চাদ্দিকে অবলোকন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বৎসরে অন্ততঃ একবার হইলেও প্রত্যেকের "বুর পারন"

"বুর পারন।"

(১) চট্টগ্রামবাসীদিগের মধ্যেও ঈদৃশী প্রথা রহিয়াছে। তাহার ফলে প্রায় প্রতি গৃহেই সূতিকা-রাক্ষসী করাল জিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রসূতির রক্ত শোষণ করিতেছে। এইরূপে কত অবলা যে নিয়ত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইতেছে, ভাবিলেও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। কিন্তু হায়, দেশবাসীর দৃষ্টি তথাপি এই দিকে পড়িতেছে কই ?

(২) "কানি-বেনা"—নেকড়ার দড়া। ইহার একপ্রান্ত অগ্নিসংযুক্ত করিয়া প্রসূতি সঙ্গে নেয়, নতুবা ভূতাদি হইতে ভয় পাইবার সম্ভাবনা আছে।

অর্থাৎ "মাথা ধোওয়া" অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর কোন আপদ বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। সচরাচর ইহা বৎসরের প্রথমেই করিয়া লওয়া হয়। পূর্ব্বে এই উপলক্ষে চাকমারাজ ১লা বৈশাখ ওঝা ও অপরাপর লোকজন সমভিব্যাহারে সপরিবারে নদী তীরে গমন করিতেন। ওঝা পূজান্তে ছাগ মোরগাদি বলিদান করিলে উপরোক্তরূপে সকলেরই বিশুদ্ধি সম্পাদিত হইত। অনন্তর ওঝা কতিপয় প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করিলে রাজা বাহাদুরও তৎসমুদয় সঙ্গে সঙ্গে পুনরুচ্চারিত করিতেন। পরিশেষে রাজা অতীত কার্য্যের জন্য ক্ষমা এবং নবাগত বৎসরের নিমিত্ত সুবিধান প্রার্থনা করিতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ আর সকলে দ্বিতীয় এবং অপর সমুদায় পরবর্ত্তী যে কোনদিন নির্ব্বাচনে স্ব স্ব পরিবারের "বুর পায়ন" কার্য্য সম্পাদন করিত। আজ কয়েক বৎসর হইতে রাজা বাহাদুর প্রাগুক্ত বলির সহিত পূজা করেন না, ঐ দিনমাত্র ভগবানের নামাদি গ্রহণে অতি পবিত্রভাবে কাটাইয়া থাকেন।

"মাথা ধোওয়া।"

কাহাকেও ব্যাঘ্রে হত্যা করিলে জ্ঞাতির সকলেই তজ্জন্য অশুচি থাকে। তজ্জন্য যথানিয়মে বিশোধন ব্যবস্থা না করিলে এক বৎসরের মধ্যে সেই ব্যাঘ্র পুনরায় সগোত্রজ এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিহত করে। এই কারণে গোষ্ঠীর সকলে পরামর্শ করিয়া যথাসম্ভব সত্বরে এক দিন নির্দ্দিষ্ট করে, এবং সেই দিন সকলে এক স্থানে বা নিতান্ত অসুবিধা জনক হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়া নদীতটে এক খানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত পূর্ব্বক ওঝা দ্বারা তাহাতে পূজা করায়। এই পূজা গৃহে অপর কাহারও অবস্থানাধিকার থাকে না। পূজায় সমাগত প্রত্যেক পরিবার এক একটি কুক্কুট এবং যে পরিবারের লোক নিহত হইয়াছে, তাহাদের হইতে একটি ছাগল বলিদান করা হয়। এ সময়ে "বড়কুরুক" এবং "ছোট কুরুক" "তারা"ও পঠিত হইয়া থাকে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত "ঘিলাকুচোইর পানি"তে বলিজাত কিঞ্চিৎ রক্ত মিশ্রিত করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাহাতে দক্ষিণ জুলপী ধৌত করে এবং পরিশেষে সেই কেশ ধৌত জলপূর্ণ পাত্র নদীতে ভাসাইয়া দেয়।

বুরপরা পূজা।

কাহারও গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইলে নদীতীরে "বুরপরা পূজা" করিয়া সাতটী কুক্কুট এবং একটি ছাগল বলিদান করা হয়। পরে উক্তরূপে সেই বলিজাত শোনিত "ঘিলাকুচোইর পানিতে" মিশাইয়া তদ্বারা পরিবারের সকলে মানবিবেচনায় পর্য্যায়ক্রমে দক্ষিণ

জুল্‌পী বিধৌত করে। অনন্তর ক্রিয়াকর্ত্তা "ওঝাকে" একটি টাকা, একখানি গামছা, একটি কুক্কুট, একবোতল মদ এবং একটী অঙ্গুরীয়ক দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া সপরিবারে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অর্ঘ্য ও আশীর্ব্বাদ।

অর্ঘ্যপ্রদানের নিমিত্ত ইহাদের সমাজে তণ্ডুলোদক ব্যবহৃত হয়। অতি সামান্য পরিমিত তণ্ডুলের সহিত সেই জল শান্তি প্রদানের জন্যও বর্ষিত হইয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবার সময়ে তণ্ডুল এবং বীজহীন কার্পাস তূলা নিষ্ঠীবন-সংপৃক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

[১] দশকর্ম্ম—প্রাথমিক কর্ত্তব্য ও বিবাহ ইত্যাদি ;

এবং

[২] অন্ত্যেষ্টি, হাড়ভাসান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান।

[১]

যদিও চাক্‌মাগণ এক সময়ে হিন্দুধর্ম্মের অধিকারে ছিল, কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল সংঘর্ষণে দশাচারের অনেকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার বিভিন্নধর্ম্মের সাহচর্য্যে দু'একটি অভিনব অনুষ্ঠানও এই সমাজে সংক্রামিত হইয়াছে। কর্ম্মসংখ্যা নিতান্ত বহুল না হইলেও অতিশয় বিশৃঙ্খল। এমন কি, সাধারণ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পার্থক্যের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিলে স্থূলতঃ বলা যায়, সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ উন্নত সম্প্রদায় আপনাদের ক্রিয়াকর্ম্মে যথাসাধ্যরূপে হিন্দুদিগের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন, সাধারণ দল এ যাবৎ ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ফলে তাহাদিগের মধ্যে নানা উচ্ছৃঙ্খলাচার প্রচলিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি যে প্রধান ভিত্তির উপর অনুষ্ঠিত হয়, যতদিন পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন এক মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া না যায়, ততদিন ইহাদের মধ্যে এক অভিন্ন-আচার চলিবার আশা নাই। বর্ত্তমানে উন্নত সম্প্রদায়েরা সমাজের মধ্যে একটা 'সংস্কার' আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন, আর সাধারণ সকলের তাহা গ্রহণ করিয়া উঠিতে অনেক দিন চলিয়া যায়, ইহাই পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যভাবের একমাত্র কারণ। যাহা হউক এ স্থলে সাধারণ ভাবে উভয় সম্প্রদায়েরই কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা করা হইল।

দশকর্ম্ম।

প্রাথমিক কর্ত্তব্য।—পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয় স্বজনকে ভোজপ্রদান এবং

অবস্থাবিশেষে বাজী পোড়ান প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উৎসবও চলিয়া থাকে। কিন্তু দুহিতা লাভে এবম্বিধ অনুষ্ঠান অতি অল্পই ঘটে।

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন।

নামকরণ বলিয়া ইহাদের কোনও ক্রিয়াবিশেষ নাই। অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন দৈবীশক্তির উপর ভারার্পণ করিবার ব্যবস্থাও দেখা যায় না। পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধগণ স্নেহগর্ভ সংক্ষিপ্ত নাম নির্ব্বাচিত করে; তাহাই শেষে 'ডাক নাম' হইয়া দাঁড়ায়। নিতান্ত বিকৃত শুনাইলেও তাদৃশ নামে সন্তানের প্রকৃতি উপলব্ধি হয়। যথা, "কুর্য্যা" (কুঁড়ে) নামে বুঝা যায়—ছেলেটী বড়ই অলস, এবং "পিড়াভাঙা" নামধেয় ব্যক্তির ভারে যে কোনদিন "পিড়া" (পিঁড়ি) ভাঙ্গিয়াছিল অর্থাৎ সে যে স্থূলকায়, সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। জন্মস্থান বিশেষেও নামকরণ হইয়া থাকে। যেমন, "বড়কলে" জন্ম হইলে পুত্র "বড়কল্যা" এবং কন্যা "বড়কলী" নামে আখ্যাত হয়। কালের কবলে অনেক পুত্র কন্যা হারাইয়া যদি পরিশেষে কোন সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলে সেই সন্তানের জন্য অতি জঘন্য নাম নির্দ্দেশ করা গিয়া থাকে। বিশ্বাস—তাদৃশ নামে যমেরও ঘৃণা হইবে! শেষে সন্তান বয়স্ক হইলে স্বীয় পছন্দানুরূপ বা গুরুগণ কর্তৃক একটা সভ্যভব্য নামে আখ্যাত হয়। অনেক স্থলে স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময়ে শিক্ষকগণই শিশুদিগের বিকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া থাকেন। আবার পিতা মাতা কর্তৃক এমন নামসকলও নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায়, যেন তাহাতে সন্তানের জীবন দীর্ঘ ও গৌরবসূচক হয়। এই আশায় প্রায় রামায়ণ এবং মহাভারতোক্ত নামই রাখা গিয়া থাকে। কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর নামেও অনেকে সন্তানের নামকরণ করে। তাহা অজামিলের ন্যায় কাঁকতালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কামনায় নহে; ইহারা আশা রাখে, সন্তানকে তন্নামধেয় দেবতা অনুগ্রহ করিবেন। এইরূপে চাক্মা সমাজের প্রায় সমস্ত নামই হিন্দুসমাজানুমোদিত। অন্নপ্রাশনেরও কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই; সুতরাং তজ্জন্য অনুষ্ঠানবিশেষেরও প্রয়োজন হয় না। সন্তানেরা অনেক দিন ধরিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে থাকে। তিন বৎসরের শিশু তাহার কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীর সহিত স্তন্যপান করিতেছে, এ হেন দৃশ্য বিরল নহে। পরন্তু ইহাদিগের এক প্রধান বিশেষত্ব যে, কোন রমণী অপর রমণীর গর্ভজাত শিশুকে স্বীয় দুগ্ধ প্রদান করে না; এমন কি শিশুর মাতা পীড়িতা হইলেও নহে।

কর্ণবেধ।—কর্ণবেধের প্রথা থাকিলেও ইহাদের ইহাদের সমাজে 'কর্ণবেধ' বলিয়া কোনও ক্রিয়া বিশেষ নাই। উচ্চ পরিবারে এই উপলক্ষে বাজী আমোদ

আহ্লাদাদি করা হয়; তা' ছাড়া ধর্ম্মার্থে কিছুই অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ সন্তান ছয় সাত বৎসরের হইলে সিঁয় বা অন্যবিধ বন্যবৃক্ষের কণ্টক দ্বারাই কান দুখানি ছিদ্র করিয়া লয়। পুরুষেরা দুই কানে দুইটীমাত্র ছিদ্র করে, কেহ কেহ তাহাতে রূপার আঙটী ধারণ করে। নতুবা ছিদ্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করেই না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের দুই কানে অন্যূন বার এবং বাম নাসিকায় একটী ছিদ্র করাই সাধারণ নিয়ম। বাস্তবিক অবলাগণ গহনা পরিধানের নিমিত্ত কিদৃশ নিষ্ঠুররূপে কষ্টবেদনা সহ্য করে! ইহা যে কেমন সখ, সহজ বুদ্ধিতে আসে না।

দীক্ষা।—আট নয় বৎসরের সময় শুভদিনে সচরাচর বিষু ও বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন এবং মাঘের পূর্ণিমায় বালকগণের "চা-মনি" অর্থাৎ দীক্ষা হয়। "ঠাকুর" (ভিক্ষু) অভাবে "রড়িগণ" (শ্রমণেরা) এই দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষাপ্রার্থীগণ পূর্ব্বাহ্নে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া যথাবিধি পবিত্রতা সাধন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সপল্লব ঘট-দীপ-তণ্ডুল ইত্যাদি সম্মুখে পশ্চিমাস্য হইয়া উপবেশন করে। অনন্তর সপ্তগুণ সূত্র দ্বারা এ সমুদায় বেষ্টন করতঃ তৎপ্রান্তদ্বয় হস্তে লইয়া "দশশীল" আচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অবশেষে ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত ও গুরুদক্ষিণা দান করিয়া শ্রমণ ব্রত গ্রহণ করে। কিন্তু ইহার কৃচ্ছ্র সাধ্যব্রত অধিকদিন পালনে অনেকেই পরাঙ্মুখ হয়; অধিকাংশ সকলে সাত দিন মাত্র আচরণেই যথেষ্ট মনে করে। আর যাহারা যাবজ্জীবন এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে; তাহারা প্রথমে "রড়ী" এবং সিদ্ধ হইলে "ঠাকুর" আখ্যা পায়। চাক্‌মা সমাজের প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, স্ত্রীলোকদিগের দীক্ষা ব্যবস্থা নাই।

যৌবনোন্মেষ।—বালিকাগণ ত্রয়োদশ বৎসরে এবং বালকেরা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে যৌবনের অধিকারভুক্ত হয়। কেহ কেহ রোগ-জীর্ণতায় সবলের সহিত অগ্রসর হইতে পারে না। আবার অনেকে 'ইঁচড়েই পাকিয়া' যায়। সাধারণ-শ্রেণীতে—কোন বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠে, তখন সে অনন্যনির্ভরতায় "জুম" কর্ত্তন করে। ইহাই সেই যৌবনপ্রাপ্তির প্রধান নিদর্শন। (১) পুত্রের যৌবনপ্রাপ্তিতে পিতামাতা প্রতিবেশী এবং অপরাপর আত্মীয় স্বজনাদি লইয়াই আমোদ-উৎসব করিতে বাধ্য।

---

(১) মঘ ও ত্রিপুরাগণদের এই যৌবনত্ব প্রাপ্ত সন্তান "গোয়ালীচেলা" সংখ্যায় অভিহিত হয়। তখন হইতে তাহারা স্বগ্রামের কুমারীগণের সহিত মিলনে কোন বাধাবন্ধক নাই। পরন্তু অন্য গ্রামের কুমারীসহ মিলনে দুই টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

বিবাহ।—ইহাদের মধ্যে এমন কি যাবতীয় পার্ব্বত্যজাতির মধ্যেই বাল্যবিবাহ বিরল প্রচলিত। পরন্তু কত বয়সে যে বিবাহ হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট নাই। কোন কোন ব্যক্তি আবার চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া যায়। বিবাহ হইলে ইহাদের "বুড়া-বুড়ী" আখ্যা হয়। নতুবা বয়স যত অধিক হউক না কেন, "গাভুর" (কুমার) ও "মিলা" (কুমারী)—অভিধা থাকে। বিগত আদমসুমারীর বিবরণীতে দেখা যায়, চাক্‌মাদিগের মধ্যে—

শ্রেণী	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে তদূর্দ্ধ বৎসরের	মোট
পুরুষ	৪২৩৯	৫৫৭১	১৬১১	১৮৪৬	১২২৬	৬০	১৪৫৫৩
স্ত্রী	৪০৩৩	৪৯২৪	১৩১৫	৭৬৬	১২৯	৩৫	১১২০২

অবিবাহিত। চল্লিশোর্দ্ধ বয়সের এই ৬০ জন পুরুষ এবং ৩৬ জন স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হইবার আশা কোথায়? অপর ২০—৪০ বৎসরের যে সকল স্ত্রীলোক অদ্যাপি অবিবাহিতা, তাহাদেরও অনেকে চিরকুমারী থাকিবে। তবে অধিকাংশ পুরুষদের দার-পরিগ্রহ করিবার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে "বিবাহিতের" তালিকায় দেখা যায়, চাক্‌মাদিগের—

শ্রেণী	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে তদূর্দ্ধ বৎসরের	মোট
পুরুষ	০	১১	১১	২৭৪	৬০১০	৪১১২	১০৪২৮
স্ত্রী	৫	১২	১৫২	১৪৪৩	৬৪৬৩	২২৩১	১০৩০৭

পত্নী-পতি লইয়া আছে। সুতরাং এই উভয় তালিকা তুলনা করিলে সহজেই পরিলক্ষিত হইবে যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সে পুরুষের এবং ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের অধিক পরিমাণে বিবাহ ঘটিয়া থাকে। পরন্তু পরবর্ত্তী তালিকায় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১০৪২৮ হইলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিরূপে ১০৩০৭ জন মাত্র হইল, দেখিয়া সন্দেহ হয়। এই ১২১ জনকে মৃত-দারও বলিতে পারা যায় না; কেন না তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর

মহাভারতীয় দ্রৌপদী বা আধুনিক তিব্বতীয় সম্প্রদায়ের মত ইহাদের সমাজে একত্রে বহু-স্বামী-গ্রহণ-প্রথা (Polyandry)ও প্রচলিত নাই, অধিকন্তু বহু-স্ত্রী-গ্রহণ প্রথা (Polygamy) রহিয়াছে (১)। তবে এইমাত্র অনুমান করা যায়, বর্জ্জিতপত্নীক পুরুষগণকেও বিবাহিত সংখ্যায় গণনা করা হইয়াছে। অপর তালিকায় আছে, চাকমাদিগের মধ্যে—

শ্রেণী	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে তদূর্দ্ধ বৎসরের	মোট
বিপত্নীক	০	২	০	৭	২১৫	৭২৫	৯৪৯
বিধবা	৩	১	১	১৩	১৬৫	১১৭২	১৩৫৫

অতএব মোট ২২৮৬৪ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৩৫৫ জন মাত্র অর্থাৎ এক ষোড়শাংশেরও ন্যূনসংখ্যক স্ত্রীলোককে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। তাহাতে আবার প্রৌঢ়া অর্থাৎ যাহাদের পুনর্বিবাহের সময় সম্পূর্ণরূপে অতীত হইয়া গিয়াছে, তেমন বিধবার সংখ্যা ১১৭২ জন। আর ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক মৃতদার অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অনেক কম। ইহাতে সহজে অনুভূত হয় যে, যুবতী বিধবাগণের প্রায়ই পুনর্বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু সেই বয়সের বিপত্নীকগণের কথা দূরে থাকুক চল্লিশোর্দ্ধে যে ৭২৫ জন মৃতদার পুরুষের সংবাদ পাওয়া গেল, জরা পীড়া বা সাংসারিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি বিশেষ অসুবিধায় না পড়িলে, তাহাদিগেরও অনেকে পত্নীবিরহিত হইয়া অধিক দিন থাকিবে না।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পিতৃকুল লইয়া "গোষ্ঠী" এবং বাসস্থান ভেদে "গোছা" আখ্যাত হয়। সেই হেতু একই "গোছা"র বিবাহের কোন বাধা

(১) কিন্তু একসময়ে দুই পত্নীর অধিক কাহারও পরিদৃষ্ট হয় না, এমন কি তৎপ্রতি সাধারণের ঘৃণার আভাস পাওয়া যায়। তাহারা কথাতেই বলে—

"হিলে বিলে তিন জোগ,
মুসলমানের তিন মোগ।"

অর্থাৎ বিলাদিতে যেমন জোঁক যথেষ্ট, তেমনি মুসলমানের স্ত্রী অনেক। (মুসলমানবন্ধুগণ সকলদিগকে ক্ষমা করিবেন)।

নাই। অথচ "সগোষ্ঠীতে" বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলিয়াই সমাজের ব্যবস্থার এত দিন এই বিধি নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিয়াছে। একমাত্র সেই দিন কুমার রমণীমোহনের বিবাহে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল; তিনি সগোষ্ঠী হইতেই পত্নীগ্রহণ করিয়াছেন। সমাজবন্ধন এই যে শিথিল হইল, এখন হইতে বোধ হয় ইহা অবাধে চলিবে। মামাত ভগ্নী, পিস্তুত ভগ্নী প্রভৃতির পাণিগ্রহণও যথেষ্ট প্রচলিত, বরং সেইগুলি যেন প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু ভাগিনেয়ী, বড়শালী প্রভৃতির সহিত বিবাহ কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্তা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেবরেরাও বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য তাহারা বাধ্য নহে।

বিবাহে সম্বন্ধ বিচার।

সচরাচর বিবাহ পঞ্চবিধ। যথা,—অভিভাবকগণের প্রস্তাবানুসারে—১। পাত্রী তুলিয়া আনিয়া ও ২। পাত্র তুলিয়া নিয়া বিবাহ, ৩। বড় বিবাহ, ৪। গৃহজামাতা আনয়ন এবং ৫। মনোমিলনে পরিণয়। এতন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীর বিবাহই সমধিক প্রচলিত। বিশেষতঃ ধনবান্-সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভিন্ন "বড় বিবাহ" হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকারের বিবাহকেও সমাজ ঘৃণার চক্ষে দেখে; এজন্য অবস্থা ভাল থাকিলে কেহই ইহাতে স্বীকৃত হয় না। এতদ্ভিন্ন বিধবা এবং পরিত্যক্তামহিলাদিগের বিবাহ ত আছেই। বিবাহের শ্রেণীবর্ণনায় বঙ্গের লেখকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর "প্রমোদ লহরী" নামক পুস্তকে নানা কৌতুকগর্ভ বিবাহের পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে তিনি, কোন্ পুস্তক অবলম্বনে জানি না, চাক্‌মাগণকে "থ্যয়ংথা" হইতে পৃথক করিয়া বিবাহের দুই বিভিন্ন পদ্ধতি চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার জানিতে ভুল হইয়াছে যে, চাক্‌মাগণ "থ্যয়ংথা" শ্রেণীর এক বিশেষ শাখা মাত্র। তদীয় "থিয়ংথ" বিবাহের বর্ণনা পাঠে বোধ হয়, "থ্যয়ংথা" শ্রেণীর অন্যতম শাখা মঘবিবাহেরই চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহা সর্ব্বাংশে যথাযথ না হইলেও, তিনি যদুদ্দেশ্যে তুলিপাত করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। তবে তিনি চাক্‌মাদিগের সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার আলোচনা না করিয়া পারি না। তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন,—"চাক্‌মাদিগের বিবাহ আরম্ভে আসুরিক এবং উপসংহারে পৈষ্টিক হইলেও মূলে সৌত্রিক বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।" কিন্তু ইহা খাঁটি আসুরিক নহে। প্রাগুক্ত প্রথম প্রকারের বিবাহে যদিও অসুরভাবের লক্ষণ আছে, তাহা ঠিক অসুরত্ব পরিজ্ঞাপক নহে। কারণ স্থল বিশেষে কন্যাকর্ত্তা যে পণ গ্রহণ করিতে

বিবাহের শ্রেণীবিভাগ।

বাধ্য হয়, তাহা বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অভাবে পড়িয়া মাত্র, কোন লাভের উদ্দেশ্য নহে। নতুবা অধিকাংশ বিবাহের মূলেই মনু-বিহিত গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস প্রথা রহিয়াছে। এইরূপে তাঁহার বর্ণনার সহিত আরও দু'এক স্থলে অনৈক্য দেখা যায়, তাহা ছাড়িয়াই গেলাম।

(অভিভাবকগণের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ।) পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পিতামাতা অপরাপর নিকট আত্মীয়দিগের সহিত "তাইন্‌মাং" (পরামর্শ) করিয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতে থাকে। তাহাদের মনোমত কন্যার সমাচার পাইলে কোন কোন সময় পুত্রকেও প্রকারান্তরে তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়। অনন্তর প্রস্তাবনার নিমিত্ত অভিপ্রেত কন্যার পিত্রালয়ে বরের পিতার যাওয়া একান্ত অপরিহার্য্য। তদভাবে মূল অভিভাবককেই যাইতে হয়। প্রথম বারে—মদ, পান-সুপারি এবং কয়েকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। পরন্তু কথনই কলা নিবেনা; তাহাতে বিফল মনোরথ সর্ব্ববাদী সম্মত। বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উঠাইতে অতিশয় সতর্কতা গ্রহণ করা গিয়া থাকে। পাত্রের পিতা বলে—"তোমার ঘরের নিকট একটি মনোহর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, আমি তাহার ছায়াতে একটি চারা রোপণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে চাহি।" ইহা হইতেই কন্যার পিতা মূল কথা বুঝিয়া লয়। যাতায়াতের সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখে। কেন না, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত এমন অনেক বিবাহ কুলক্ষণ দ্বারা ভাঙিয়া গিয়াছে। যদি কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষকে মোরগ, জল বা দুগ্ধ লইয়া দক্ষিণপার্শ্বে যাইতে দেখা যায়, তবে লক্ষণ—শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা গেলে, অথবা কোন কাক যদি বাম পার্শ্বে বসিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি তাহারা পথে আসিতে কোনও জীবজন্তুর মৃত-দেহ দেখিতে পায়, তবে আর পদৈকমাত্র অগ্রসর হয় না, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনও বন্ধ করিয়া দেয়। বৃদ্ধদিগের মুখে এমন বহু উদাহরণ শুনা যায় যে, এই সমস্ত শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি অবহেলা—পক্ষান্তরে প্রভূত অসুখের কারণ হইয়াছে। পথিমধ্যে এইরূপ শুভাশুভ দর্শন লইয়া ছোটনাগপুরের ওরাওন জাতির মধ্যেও বড় বেশী কঠোর বিধান আছে; তবে তাহারা কেবল কন্যাকর্ত্তার বরদর্শনে গন্তব্য পথে মাত্র এই শুভাশুভ ফলের শাসন মানে। এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত, "ছাদং" এর সময় অর্থাৎ আষাঢ়পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমার মধ্যে বিবাহের কোনরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রস্তাবনা।

দ্বিতীয়বারেও প্রথমবারের ন্যায় অধিকন্তু পিষ্টক, মোরগ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া বরের পিতা পুনরায় উপস্থিত হয়। এ যাত্রায় উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধা বিবেচিত হইয়া থাকে। এবং উপস্থিত পাত্রের সহিত সম্বন্ধ করিতে পাত্রীর পিতামাতার অভিমতও অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বারেও সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় না। অনন্তর তৃতীয়বারেও দ্বিতীয়বারানুরূপ "তত্ত্ব" সামগ্রী লইয়া যায়, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও থাকে।

বন্দোবস্ত।

এবার পণ ধার্য্য করা হয়। সাধারণতঃ ৫০।৬০ তোলা রূপার গহনা এবং ১০০।১২০ টাকা পর্য্যন্ত কন্যার পণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; সম্ভ্রান্ত পরিবারে কন্যাপণের (১) প্রচলন নাই। এই সময়ে কন্যা তুলিয়া আনা হইবে, কি বরকে তুলিয়া নিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে, প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বর তুলিয়া নিয়া বিবাহে বরপক্ষীয়ের খরচ অবশ্য অল্প, কিন্তু ইহা খুব বিরল প্রচলিত। হিন্দু সমাজের কলঙ্ক কুলীন সম্প্রদায়ের মত যৌতুকের সামগ্রীতে গৃহপূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাদের সমাজে এযাবৎ হয় নাই। বর পাত্রীর পিত্রালয়ে গিয়া বিবাহ করিতে নিতান্ত লজ্জা ও অপমান মনে করে। পরন্তু ভাবী বৈবাহিকের রুধিরলোলুপ এমন কোন বরের পিতা চাক্‌মাজাতিতে দেখা যায় না, এবং তাদৃশ বরবিক্রয়ের প্রথাও ইহাদের সমাজে প্রচলিত নাই। সে যাহা হউক, উপরোক্ত প্রস্তাবে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পাদিত হইলে, শুভদিন ধার্য্য করে। ফসলের কার্য্য হইতে অবসর কালই বিবাহের প্রশস্ত সময়; এই নিমিত্ত সচরাচর মাঘ ফাল্গুন মাসেই দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ এই সময়ে হাতে টাকা পয়সারও অভাব হয় না এবং সকলে কাজকর্ম্ম হইতেও কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এইরূপে কথাবার্ত্তা সাব্যস্ত হইয়া গেলে কোন কোন বরের পিতা ভাবী পুত্রবধূকে উদ্বাহস্থিরতা জ্ঞাপক একটি অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়া আইসে। অবশেষে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে বরপক্ষ কন্যার পিতার নিকট হইতে অচিরে উপস্থিত বিবাহের নিমিত্ত মদ্য প্রস্তুত করিবে কি না অনুমতি লইয়া যায়।

বিবাহের পূর্ব্বদিন যে সকল বাস্তুকরেরা আসে, তাহাদের প্রথম বাস্ত হইতে বয়োবৃদ্ধগণ ভাবী পরিবারের শুভাশুভ গণনা করে। এই প্রথম বাস্তুকে "খোলা-

(১) আরও সুখ সংবাদ কুকিদিগের মধ্যে কন্যাপণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শুনা যায়, পূর্ব্বে কোনও বালিকার বিবাহে পণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে বিবাহের অব্যবহিত পরেই দম্পতীর মৃত্যু ঘটে। তদবধি এই সর্ব্বনাশিনী প্রথা রহিত হইয়াছে।

মানলি" (১) বলা হয়। এতদ্ভিন্ন বরপক্ষীয় কোন স্ত্রীলোক কলাপাতায় পান এবং সুপারীর দুইটী 'পুটুলী' করিয়া একত্রে নদীতে ভাসাইয়া দিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা দেখে। যদি 'পুটুলী' দুইটি মিলিত হইয়া ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে ভাবী দম্পতির প্রগাঢ় সদ্ভাব সূচিত হয়, অন্যথা 'পুটুলী' দুইটী বিপ্রকৃষ্ট হইয়া ভাসিলে পরস্পরের মধ্যে চিরজীবনই মতভেদ ঘটিয়া থাকে। বিবাহ বরের বাড়ীতে হইবার কথা হইলে, তদনন্তর সেই মহিলা নদী হইতে এক কলসী জল লইয়া আইসে; পক্ষান্তরে কন্যাপক্ষ হইতে জল তোলান হয়। তদ্দ্বারা বিবাহের দিন বরকন্যাকে স্নান করাইয়া থাকে। অধিবাস দিবসে বরকন্যা উভয়পক্ষেরই গৃহসম্মুখীন দুইধারে সপল্লব মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়া থাকে।

অধিবাস দিনের কার্য।

১। পাত্রী তুলিয়া—আনিতে হইলে বিবাহের পূর্ব্ব দিন, পথ যদি দূরবর্ত্তী হয় তবে তাহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ যাহাতে বিবাহদিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া বরের বাড়ীতে উপনীত হইতে পারা যায় সেই হিসাবে, বরের পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা নানাবিধ বাদ্যাদি সমভিব্যাহারে কন্যা আনয়নের জন্য যাত্রা করে। তাহাদের সঙ্গে সগোত্রজা এক অনূঢ়া কিশোরী সুরঞ্জিত "ফুলবারেং (২) এর মধ্যে করিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সমস্ত গহনা, দুই দুইখানি "পিঁধন" (৩), "খাদী", চাদর, "খবং" ও কুর্ত্তা (তন্মধ্যে একটি ফুলবিহীন ও অন্যটি "ফুলদার"; এই "ফুলদার" কুর্ত্তা বিশেষতঃ বিবাহেই ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা এ সময়ে গহনাগুলি বাঁধিয়া নিয়া থাকে) একখানি চিরুণী, এক বোতল নারিকেল তৈল লয়; এবং তৎসঙ্গে একটী মোরগ, ৭০০ সুপারী ও ৭০০ পানের বাড়া (৪) উপঢৌকন যায়।

এদিকে কন্যাকর্ত্তা বিবিধ ভোজ্যোপকরণ আহরণ করিয়া থাকে। এবং বরযাত্রিগণের নিমিত্ত প্রাঙ্গণে স্ত্রী ও পুরুষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৈঠক স্থান গঠিত হয়। তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ স্বাগতসম্ভাষণাদি দ্বারা

---

(১) ইহাতে প্রাঙ্গনে একটী জায়গা করিয়া তাহাতে পান সুপারি, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া ঘট স্থাপিত করে; এই নিমিত্ত টাকাও একটী দিতে হয়।

(২) "ফুলবারেং"—'চ্যাচাড়ী' নির্ম্মিত ঝুড়ি বিশেষ।

(৩) "পিঁধন"—স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র। বিস্তৃত পরিচয় পরে দেওয়া হই[illegible]

(৪) পানের বাড়া—এক এক খণ্ড পাতায় কিঞ্চিৎ পান এবং কিয়দংশ সুপারি মুড়িয়া [illegible]

তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াযথানির্দ্দিষ্ট স্থানে বসায়; এবং তখন মদ, তামাক ইত্যাদি শিষ্টাচারোপহার অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে।

অভ্যর্থনা।

কিয়ৎক্ষণ পরে পাত্রীপক্ষীয় সকলে নানা মঙ্গলায়োজনের সহিত প্রথমে উপরোক্ত কিশোরীকে গৃহে তুলিয়া, পরে অন্যান্য বরযাত্রীগণকেও ঘরে লইয়া যায়। এই সঙ্গে আয়দেশে স্থাপিত মঙ্গল ঘট এবং প্রদীপাদিও উঠাইয়া আনা হয়। পরে গহনাদি যাবতীয় দ্রব্য কন্যার পিতামাতা বুঝিয়া লয়, এবং সকলে আহার করিয়া উঠিলে বরপক্ষীয়া মহিলাগণ সেই গহনা এবং পরিচ্ছদের এক প্রস্ত (set) পাত্রীকে পরাইয়া দেয়।

অনন্তর সকলে নিদ্রা যায়, এবং পরদিন প্রত্যূষে ঘট প্রদীপাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক অপরাপর শুভানুষ্ঠানের সহিত পিতামাতা দুহিতারত্নকে বিদায় দান করে। এই সময়ে "সাঁকো"র পথ বন্ধ করিয়া সপ্তগুণ সূত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। বরপক্ষীয়েরা পাত্রী বাহির করিয়া আনিতে কন্যার মাতা সূতাখানি ছিঁড়িয়া দেয়, ইহাতেই তাহাদের সহিত কন্যার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় (১)। যাহা হউক, কন্যার সমভিব্যাহারে তাহার পিতা কি পিতামাতা উভয়েই গিয়া থাকে। বরের বাড়ীতেও নানা মঙ্গলায়োজনের সহিত পাত্রী তুলিয়া লইবার প্রথা আছে। এই বিবাহদিন প্রাতেই "চুঙ্‌লাং" পূজা হইয়া থাকে।

কন্যাযাত্রী।

রাত্রে (কোন কোন পরিবারে গণৎকার-নির্দ্ধারিত লগ্নে) বরকন্যাকে উপযুক্ত বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া শয়নকক্ষে বিবাহবেদী-উপরি উপবেশন করায়। স্ত্রী স্বামীর বামপার্শ্বে স্থান পাইয়া থাকে। অতঃপর বরের কোনও আত্মীয় এবং আত্মীয়া বরকন্যার প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে তাহাদের পশ্চাতে বসে। ইহাদিগকে "ছাঁয়লা" এবং "ছাঁয়লী" বলা হয়। ইহারা একখানি শুভ্র নববস্ত্র লইয়া উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "জোড়গাঁট বাঁধিবার হুকুম আছে ত?" সকলে বলিয়া উঠে—"আছে" "আছে" "আছে"। সম্মতি পাইবা মাত্রই "ছাঁয়লা-ছাঁয়লী" উক্ত বস্ত্রের দ্বারা দম্পতীকে বদ্ধ করে। তখন তাহারা পরস্পরকে "বদাগুল্যা ভাত"

উদ্বাহ ক্রিয়া।

(১) ত্রিপুরাদিগের মধ্যেও ইদৃশী প্রথা আছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ। পাত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার সময় তাহার ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূ (বাহই) দ্বারে একটি মূলী বাঁশ আড় করিয়া ধরে, বরপক্ষীয়েরা তাহা ভাঙ্গিয়া কন্যা লইয়া আসে।

অর্থাৎ সিদ্ধ ডিম্ব মিশ্রিত অন্ন এবং কলা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওয়ায়, ফলে মুখস্পর্শ করাইয়া থাকে। স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামী মুখে এবং স্বামী বাম হস্ত দ্বারা প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করতঃ মুখমধ্যে উল্লিখিত ভক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্য এই কার্য্যেও "ছাঁয়লা-ছাঁয়লী"র বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেননা, উপস্থিত সাধারণের (১) সম্মুখে নবদম্পতির ব্রীড়ানিপীড়িত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়ই থাকে। তখন তাহারা স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে সমর্থ নহে; প্রতি কার্য্যেই অন্যদীয় সহায়তা অপেক্ষা করে! ইহা আর খুলিয়া প্রকাশের চেষ্টা বৃথা, বিবাহিত পাঠকপাঠিকাগণ সহজেই বক্তব্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। খাওয়ানের বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত বয়োবৃদ্ধগণ নবীন দম্পতীর মস্তকে শুভাশীষবাক্যের সহিত নদীজল বর্ষণ করে। ইহাই স্বস্তি বাচন—পক্ষান্তরে কর্ম্মের সাফল্য ঘোষণা! অনন্তর দম্পতী আচম্বিতে উঠিয়া পড়ে। এতন্মধ্যে যদি নবোঢ়া পূর্ব্বে উঠে, তবে সে সর্ব্বদা স্বামীর অপরিমেয় ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সংস্কারের আশ্বাস আছে। পরে স্বামী স্ত্রী দুই পৃথক স্থানে নিদ্রায় রাত্রি কাটায়।

শুদ্ধিবিধি।

পরদিন অতি প্রত্যূষে দম্পতী গাত্রোত্থান করিয়া জনৈক "ওঝার" সহিত নদীকূলে যায়; এবং তথায় দুইটী মোরগের রুধির, 'ঘিলা' ও 'কুঁচ' বাঁটা, কিঞ্চিৎ মদ্য ও সোনারূপার জলে "মাথা ধুইয়া শুদ্ধ" হয়। ইহাকে বিবাহের "বুরপারণ" বলে। অতঃপর চারিদিকের লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই তাহারা বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পরিশেষে আহারাদির পর আত্মীয়স্বজাতি সমাগত স্ত্রী পুরুষ সকলে (অবশ্য দুই ভিন্ন দলে) সভা করিয়া বসে। তখন নবদম্পতী তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে উপনীত হয়; এবং যথোচিত অভিবাদন পুরঃসর পূজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিষ্টীবনপূক্ত-সতণ্ডুল-তুলা শুভনির্ম্মাল্য স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতীর কিছু আর্থিক লাভও ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ এ সময়ে কন্যার পিতা নবজামাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া দেন,—'(স্বীয় কন্যাকে জামাতার হস্তার্পিত করিয়া)

বিদায় সভা।

(১) এস্থলে 'সাধারণ' বলিতে স্বজাতীয় বুঝিতে হইবে। প্রত্যুত ইহাদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথার কঠোরতা না থাকিলেও স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহাকেও বিবাহ দেখিতে দেয় না; এমন কি বিজাতীয় বন্ধুও বন্ধুর বিবাহ দেখিতে ভাগ্যবান নহে।

ইহাকে গ্রহণ কর। আমি বড় সাধ করিয়া ইহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। এ নিতান্ত বালিকা, গৃহকর্ম্ম কিছুই জানে না। যদি কোন সময়ে তুমি কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া দেখ যে, ভাত পুড়িয়া ফেলিয়াছে, অথবা তদ্রূপ অপর কোন দোষ করিয়াছে, তবে তাহাকে শিক্ষা দিও, প্রহার করিও না। এরূপে তিন বৎসর চলিয়া গেলেও যদি অনিষ্ট করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রহার করিতে পার, তজ্জন্য আমি অসন্তুষ্ট হইব না। কিন্তু একবারে প্রাণে মারিয়া ফেলিলে, আমি তোমা হইতে প্রাণের মূল্য দাবী করিব। অনন্তর কন্যাপক্ষীয় সকলে এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনদিগেরও প্রায় অনেকে বিবাহ বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

জামাতার প্রতি উপদেশ।

বিবাহের দুই তিন দিন পরে বর নানাবিধ মদ্য এবং পিষ্টকাদির সহিত নবোঢ়াসমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন করে এবং তথায় দুই চারি দিন অবস্থানের পর সস্ত্রীক চলিয়া আইসে। ইহারই নাম "বিবাহের "ছুঁইদ্ ভাঙান" অর্থাৎ ইহাতেই বিবাহজনিত অপবিত্রতা (?) নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, ইহা না হইলে নবদম্পতীর একত্র বাসও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে, এবং তাহারা অপর কাহারও মঞ্চেও উঠিতে পারে না। চাক্‌মাসমাজের ইহা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংস্কার। পরন্তু সেই বৎসরেরই বিষুব সংক্রান্তিতেও নববিবাহিত যুবককে সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ী বেড়াইয়া যাইতে হয়। বাস্তবিক বিবাহের পর ইহারা যেন পক্ষিদম্পতী, অথবা অনেকটা পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের মত। সতত উভয়ে একত্রে থাকিতে চেষ্টা পায়। বিশেষতঃ প্রথম বৎসর পরস্পরের পাশ ছাড়া হওয়া কোনরূপেই বিধিসঙ্গত নহে।

বিবাহের ছুঁইদ্ ভাঙান।

২। বর তুলিয়া—নিয়া বিবাহ এবং উপরি বর্ণিত বিবাহ-পদ্ধতিতে বিশেষ কোন তারতম্য নাই; কেবল বর গৃহের কার্য্যগুলিও কন্যার পিত্রালয়ে হইয়া থাকে মাত্র। ইহাতে বরযাত্রীদিগের সহিত বরও গিয়া থাকে। তাহারা যাহাতে বিবাহ দিন প্রাতে পাত্রীর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতে পারে, সেই হিসাবে যাত্রা করে। বলা বাহুল্য, 'বর তুলিয়া বিবাহে' "বিবাহের ছুঁইদ্ ভাঙাইবার" প্রয়োজন হয় না।

বড় বিবাহ।—রাজপরিবার এবং সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবার ভিন্ন অপর সাধারণে এ বিবাহের অধিকারী নহে। ইহা একপক্ষে যেমন ব্যয়সাধ্য পক্ষান্তরে তেমনি বংশমর্য্যাদাসাপেক্ষ। বিবাহের আনুষঙ্গিক অপরাপর কার্য্য—পাত্রী তুলিয়া আনিয়া বিবাহেরই অনুরূপ। তবে সেই সঙ্গে আদ্ধাদির ত কথাই নাই। অধিকন্তু তিন খানি অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মিত হয়। তাহার এক ঘরে বরপক্ষ, আর এক ঘরে

কন্যাপক্ষ থাকেন। অপর গৃহ খানি "ফুল-ঘর" নামেই আখ্যাত; তাহাতে নবদম্পতিকে যথাবিধি বসাইয়া "ঠাকুর" (ভিক্ষু) 'জয়মঙ্গলসূত্র' রূপান্তরে "সিঙ্গলযোগলতারা" শুনাইয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে সাধারণ বিবাহেও এই "তারা" (শাস্ত্রগ্রন্থ) পঠিত হইত; এক্ষণে প্রায় অন্তর্হিত। এই "বড় বিবাহে"ও নবদম্পতীকে "ছুঁইদ্‌ভাঙাইয়া" আসিতে হয়।

গৃহ জামাতা।—যাহারা নিতান্ত সম্বলহীন এবং যাহাদের পরিবারে অপর কেহ নাই, তাহারা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া শ্বশুরেরই ব্যয়ে বিবাহ করিয়া থাকে। পাত্র তুলিয়া নিয়া বিবাহের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। গৃহ জামাতা হইলেও আজীবন শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান অধুনা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। অনেকেই আপনাকে স্বশক্তিতে পরিবারচালনক্ষম বুঝিলে স্ত্রীকে লইয়া সরিয়া পড়ে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর বিবাহ কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুসমাজ হইতেও ইহা বহুপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নতুবা কুলীন পরিবার যেরূপ ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল, এতদিন উহা সেই ভাবে প্রবল থাকিলে সম্ভবত এতদিনে হিন্দুসমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যাইত!

মনোমিলনে বিবাহ।—ত্রিপুরাসমাজে এই বিবাহ "হিক্‌নানামী" আখ্যায় প্রথিত। প্রাচীনকালে হিন্দুসম্প্রদায়ে যে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশের "কোর্টসিপ" (Courtship) এবং ব্রাহ্মসমাজের মনোমিলন পদ্ধতিতে তাহার কিঞ্চিৎ গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে দম্পতী পরস্পরকে "ত্বং" মে পতি— "ত্বং মে ভার্য্যা" ইত্যাকার জ্ঞানে গ্রহণ করিলে "গান্ধর্ব্ব বিবাহ" সম্পাদিত হইয়া যায়। ফলতঃ এইরূপ পরিণয় অতি আদিম প্রথা। অনেক দিন হইতে ইহা লইয়া নীতিশাস্ত্রবিদসমাজে গভীর গবেষণা চলিতেছে; এযাবৎ তাহার কোন প্রকৃষ্ট মীমাংসা স্থিরীকৃত হয় নাই। সত্য বটে স্ত্রী পুরুষের অদ্বিতীয়া সঙ্গিনী। সুখে দুঃখে—সম্পদে বিপদে এ হেন সমভাগী আর কেহই নহে। গৃহসুখ, এমন কি সাংসারিক যাবতীয় সুখ—শান্তি তাহারই উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে পতিই অবলার অনন্যগতি! প্রাণের সামান্য বেদনাটি জানাইতেও এ জগতে স্বামী ভিন্ন তেমন আর কেহ নাই। তবে ভাবী জীবনের সুখশান্তির অনন্যপন্থা স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কি সমীচীন ব্যবস্থা নহে? কিন্তু তাহারা বিচারকের কিরূপ উপযুক্ত, ইহাই আগে চিন্তা করিবার বিষয়। নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যৌবনকাল মনে প্রবেশ করিলে মনুষ্যের প্রকৃতি বড় অস্থির প্রায় হয়। বিশেষতঃ অপরিপক্ক বুদ্ধির সহিত রূপজমোহ মিলিত হইলে কি যে ভীষণ হয়—

করে, তাহা স্মরণ করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সুতরাং মদনায়ুধ-বিভ্রান্ত যুবক-যুবতীতে যে সম্মিলন সংগঠিত হয়, তাহা সকল সময়ে সুফলপ্রসূ হইবার ভরসা কোথায়? আবেগ ফুরাইলে, উত্তেজনা দমিত হইলে, পরস্পরের চিত্তপার্থক্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে আরম্ভ হয়; এবং তাহারই ফলে—"কোর্টসিপের" পরিণামে "ডাইভোর্স" (Divorce) এবং মনোমিলনের জের বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি ঘটিতে থাকে। তাদৃশী দুরবস্থায় তাড়নাতেই বোধহয় হিন্দুসমাজ হইতে স্বয়ম্বর প্রথা রহিত হইয়াছে। অধুনা চাক্‌মাগণও ইহা ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে ইহা একরূপ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু সাধারণ সমাজে মনোমিলনে সম্বন্ধ যত অধিক, অভিভাবকদিগের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ তাহার অর্দ্ধেকও নহে। এই বিবাহকে মনুর ভাষায় "গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস"-শ্রেণীভুক্ত করা যায়; ইহার সহিত পাশ্চাত্য সমাজের স্পেনীয় ও ফরাসীয় বিবাহব্যবস্থার গাঢ়তর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

যৌবন ও মুক্ত-যুবতী।

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইহাদের সমাজে অনূঢ় এবং অনূঢ়াদলের সম্মিলন প্রায় অব্যাহত। যুবক-যুবতীর মধ্যে সেই সুযোগে প্রণয়-শক্তি জন্মিলে, কিম্বা "মহামুনি" মেলায় সূচিত পূর্ব্বরাগে মনোমিলন হইয়া গেলে, তাহারা উভয়ে একযোগে পলাইয়া যায়। এদিকে পিতামাতা যখন জানিতে পায় যে, তাহাদের পুত্র বা কন্যা অমুকের কন্যা বা পুত্রের সঙ্গে পলাইয়াছে, তখন কন্যার পিতা আসিয়া হেড্‌ম্যান সমীপে যুবকের নামে অভিযোগ জানায়। উপায়াভাবে যুবকের পিতামাতাও যুবতীর পিতামাতার নিকট তাহাদিগের পরিণয়ে সম্মতি প্রার্থনা করে। অবশেষে যুবক-যুবতী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হেডম্যানের কাছে বিচার উপস্থিত হয়। যদি যুবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেই বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া গিয়াছে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেই দুর্ম্মতি যুবকের ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। অন্যথা পরস্পরের স্বীকৃতি পাইলে বিচারে কিছু অর্থের দ্বারা কন্যার পিতামাতাকে সম্মত করিয়া তাহাদের যথাবিধি বিবাহ হইয়া যায়। কোন কারণে অভিভাবকদিগের সম্মতি পাওয়া না গেলে, তথাচ যদি যুবক যুবতীর সহিত প্রবল থাকে, তাহারা পুনরায় পলায়ন করে। এইরূপে চারিবার পর্য্যন্ত পলাইতে পারিলে কন্যার পিতা আর কুলমর্য্যাদাহানির দাবি করিতে পারে না। এবং সেই অচ্ছেদ্যপ্রণয়ী পণ হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দ্বিতীয়বার পলায়নের পর আর

প্রণয়ে পলায়ন।

সম্মতিতে বিবাহ।

কেহই তাহাদের বিবাহে বাধা দেয় না। এই বিবাহে "চুঙ্‌লাং" পূজা এবং নূতন কুটুম্বগণকে লইয়া এক পরিপাটি ভোজ ভিন্ন অপরাপর আনুষঙ্গিক কার্য্য না করিলেও চলে ; হয়ও না।

হতাশ প্রণয়।

কোন কোন সময় এবংবিধ সম্মিলনে ভগ্নমনোরথ হইয়া ভীষণ করুণান্তক অভিনয় ঘটে ; তখন ইহা চিরজীবনের তরে অসুখের কারণ হইয়া থাকে। কাপ্তেন লুইন স্বীয় পুস্তকে* এরূপ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে তাহারই মর্ম্মানুবাদ তুলিয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ করিতেছি :—

* The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein—P. 72-73

"ভূপিয়া নামে জনৈক যুবক সন্তামুলা নাম্নী বালিকার সহিত প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই সন্তামুলা মাতৃহারা হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুরাধন সস্ত্রীক ভিন্ন গ্রামে বসতি করিত। সন্তামুলার অপর ভ্রাতা হীরাধন ও বৃদ্ধপিতার সহিত জুমের সময় "মইনঘরে" বাস করিতেছিল। ভূপিয়া তাহাকে বিশেষ ভাল বাসিত ; কোনরূপেই তাহার পাশ ছাড়া হইতে চাহিত না। জুমকার্য্যের সহায়তা প্রভৃতি ব্যপদেশে সে সর্ব্বদাই তাহাদের পরিবারের ভিতর থাকিতে প্রয়াস পাইত এবং প্রায় প্রতিদিনই তাহাদের বাড়ীতে আহার ও "গুদীতে" শয়ন করিত। কিন্তু সে এত দরিদ্র ছিল যে, সন্তামুলার অভিভাবকদের সহিত প্রস্তাবক্রমে বিবাহ করিবার সাহস পায় নাই। এইরূপে প্রায় দুই বৎসরধরিয়া তাহাদিগের প্রণয়ের আদান প্রদান চলিতে থাকে। অবশেষে উভয়ে একযোগে পলায়ন করিল। ঘটনার অবশিষ্ট কথাগুলি হীরধনের মুখেই প্রকাশ করা যাইতেছে।—'গত শুক্রবার আমি যখন কার্য্যস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোর ভগ্নী কোথায় ? অনেকক্ষণ হইল সে জল আনিতে গেল, কিন্তু অদ্যাপি ফিরে নাই। অকর্ম্মণ্য ভূপিয়া আমাদের এখানে নিরন্তর ঘুরিত। আমার সন্দেহ হইতেছে, বুঝিবা সন্তামুলা তাহারই সঙ্গে পলাইয়া গেল।' এই কথায় আমি আরও দুই তিন জন যুবককে সঙ্গে লইয়া ভগিনীর উদ্দেশে বাহির হইলাম। এক ক্ষুদ্র সরিতীরে তাহাদের সহিত দেখা হইল। ভূপিয়া অগ্রে ; সন্তামুলা তাহার হস্তধারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। এই দৃশ্যে আমি ক্রোধান্ধ হইয়া হস্তস্থিত দা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতেই সে একপার্শ্বে লাফাইয়া পড়িল এবং সেই আঘাত আমার ভগ্নীর উপর পড়িয়া তাহার পার্শ্বদেশ কাটিয়া ফেলিল। হায়! তৎক্ষণাৎ সেও 'ভাই' বলিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আমি ভয়ে পলাইয়া গেলাম। যদিও আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানিতাম না যে, তাহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে। কেননা, প্রেম-সমস্যা অনুসন্ধান—আমাদের জাতীয় প্রথা নহে। যদি ভূপিয়া আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত করিত এবং নিয়মিত পণ দিতে পারিত, তাহা হইলে আমরা বন্ধুবান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকেই বিবাহ দিতাম। কিন্তু সে বিবাহের উপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না বলিয়া তাহা করে নাই। অগত্যা সন্তামুলাকে লইয়া পলাইয়া ছিল।" ইত্যাদি।

একটি চিত্র।

হায়রে, উদ্দাম প্রণয়ের পরিণাম! ইহা ছাড়া এইরূপই প্রায়শঃ ঘটে যে, কোন রমণী একজনকে পূর্ব্বে বিশেষরূপ আশ্বাস দিয়াছিল, শেষে ঘটনাচক্রে অপরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যায়। ইহাতে সেই হতাশপ্রণয়ী জীবনের মমতা তুচ্ছ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইহলোক হইতে সরাইতে সচেষ্ট হয়। বৎসরে এদেশের দুই চারিটী হত্যা এই নিমিত্তই ঘটিয়া থাকে।

বিধবা এবং পরিত্যক্তা রমণীদের বিবাহে।—বিশেষ কোনও আমোদ-উৎসবাদি হয় না, কেবল স্বগ্রামবাসী সকলকে একটি ভোজ দেওয়া গিয়া থাকে মাত্র। পূর্ব্বপতির ঔরসজাত সন্তানাদি অধিকাংশস্থলে তাহাদের পিত্রালয়েই থাকে, আর নিতান্ত অপোগণ্ড হইলে যদি মাকে ছাড়া থাকিতে না চাহে, তাহা হইলে পরবর্ত্তীস্বামীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে দান করিয়া না গেলে কেহই বৈপিত্রিক সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না।

গর্ভধানাদি ইহাদের সমাজে নাই। পুংসবন্ সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ প্রভৃতি গর্ভিণীসংস্কারগুলিও এই সমাজে কোন কালে ছিল কি না, কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু এই সকলের পরিবর্ত্তে প্রসূতিদিগের মঙ্গলার্থ প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে "গাংশালা" (১) ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। গর্ভের সপ্তম মাসে অথবা প্রসবের পর শুভদিন নির্দ্দেশ করিয়া, পূর্ব্বদিন যথানিয়মে "ওঝা" নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী নদীজলে—জলপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদুপরিভাগে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করে। অনন্তর বাড়ীতে আসিয়া একটি হাঁড়িতে একটা আস্ত সুপারী স্থাপন পূর্ব্বক উহার মুখ "খাদী" দ্বারা আবৃত করিয়া লয়। পরে সুদীর্ঘ সূতার একপ্রান্ত সেই "হাঁড়ির" গলায় সাতপাক জড়ায় এবং হাঁড়িটী সাতবার গর্ভিণীর বা প্রসূতির মস্তক 'নিছিয়া' যথাসম্ভব সোজাসুজি পথে সেই "গাংশালা"য় লইয়া আসে। কিন্তু সূতাখানি এত লম্বা থাকে যে, তাহার এক প্রান্ত সেই "হাঁড়ি"তে আবদ্ধ রহিলেও অপর প্রান্ত 'পোয়াতি'র আবাস গৃহে থাকে। ব্রতকার্য্যে প্রথমে "আগ্ চাওয়া" হইয়া গেলে পূজা ও বলিদান প্রভৃতি ক্রমে সম্পাদিত হয়। অনন্তর "ওঝা" সূতা ধরিয়া অগ্রসর হয়; এবং প্রসূতির স্বামী সেই "হাঁড়ি ও বলিদত্ত মোরগ লইয়া অনুসরণ করিতে থাকে।

গাংশালাব্রত।

(১) "গাং"—নদী, "শালা"—গৃহ; নদীতে গৃহ প্রস্তুত করিয়া যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে "গাংশালা ব্রত" কহে।

"হাঁড়ি"টী গৃহে আনিয়া তুলিয়া রাখিবার পর, প্রাঙ্গণে একটি শূকর বলি দেওয়া হয়। ইহার নাম "আগিদা"। অবশেষে সাধ্যমতে আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশিগণকে ভোজদানের ব্যবস্থা আছে।

[২]

অন্ত্যেষ্টি।—মৃত্যুর পরে স্নানাদি করাইয়া শবকে নববস্ত্র পরিধান করায়; এবং "বিজাপা"য় তিনটী বংশবোঝা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি শয্যা রচনা পূর্ব্বক উহাকে তাহাতে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া রাখে। অনন্তর শবের শিরোদেশে ও পদপ্রান্তে দুইটি অগ্নিপিণ্ড এবং বক্ষোপরি কতক খই ও একটি টাকা রাখার পর রত্নী "মালেম তারা" পাঠ আরম্ভ করেন। রাজা বা গণ্যমান্য লোকের মৃত্যুতে "আরেস্তামা তারা"ও পঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে "ঢুল" (ঢোল) বাদ্য চলে, এবং শবরক্ষক যুবকগণ এই "ঢুল" বাজাইয়াই রাত্রি যাপন করে। অন্ত্যেষ্টির আয়োজন এবং আত্মীয় স্বজনের আগমন পর্য্যন্ত শব এইরূপে থাকে। পরে সুবিধানুরূপ দিনে চরম সংস্কারের নিমিত্ত সকলে প্রস্তুত হয়। "বুধবার—লক্ষ্মীবার;" সুতরাং সেইদিন মৃতসৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া অনেক পরিবারে শুক্রবারেও অন্ত্যেষ্টি স্থগিত থাকে। কিন্তু শব যতদিন গৃহে থাকে, ততদিন বাড়ীতে উনুন জ্বলে না। তাহারা সকলে নিকটবর্ত্তী আত্মীয় বা "আদমেয়" অপর কাহারও গৃহে একে একে আহার করিয়া আসে।

শবসংস্কার।

নির্দ্দিষ্টদিনে সৎকারের যথাবিধি আয়োজন হইলে পূর্ব্ব স্থাপিত অগ্নিপিণ্ডদ্বয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের মুখস্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দেয়; এবং তৎস্থলে পুনরায় দুইটী সদ্যপক্ক অগ্নিপিণ্ড স্থাপন করে। অনন্তর শবের পাদকনিষ্ঠাঙ্গুলিতে সপ্তলহর সূত্রের এক প্রান্ত বদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত একটি মোরগশাবকের অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া দেয়; মৃতব্যক্তির পরিবারস্থ সকলে সেই মোরগশাবক ধরিয়া থাকে। তখন "আদমেয়" জনৈক বয়োবৃদ্ধ সূত্রের নিম্নে একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া "তাগল" (দা) দ্বারে সমাগত আর সকলকে জিজ্ঞাসা করে,—'মরা হইতে জীবিতদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হুকুম আছে কি না?" তাহারা যুগপৎ "আছে" "আছে" বলিয়া উঠিলে, মধ্যস্থলে একই ঘা'য়ে মৃত-জীবিতের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে "আনিজা তারা" পাঠ আরম্ভ হয়, এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতেই সকলে শবকে শ্মশানভূমিতে লইয়া চলে। সচরাচর স্রোতস্বতী-তীরেই শ্মশান নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধচ্ছেদ।

তথায় আনয়নের পর শেষোক্ত অগ্নিপিণ্ড দুইটী হইতে সাতবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শবের মুখস্পর্শ করাইয়া পরিত্যাগ করে।

পূর্ণবয়স্কের মৃত্যুতেও সমর্থ হইলে শ্মশানে রথ টানিবার আয়োজন করা হয়। এই রথ নির্ম্মাণেও আবার ইতরবিশেষ ব্যবস্থা আছে। রাজপরিবারে বা তদ্‌ঘনিষ্ঠ কেহ মরিলে "পঞ্চরত্ন" রথ প্রস্তুত হয়, অপর সাধারণের মৃত্যুতে একটিমাত্র শৃঙ্গ থাকে। একটি কাষ্ঠমঞ্চোপরি নানা সুগন্ধ দ্রব্যাদির সহিত শব রাখিয়া, সেই শবাধার রথোপরি স্থাপন করে। অতঃপর উপস্থিত সকলে সমান দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর

রথ টানা।

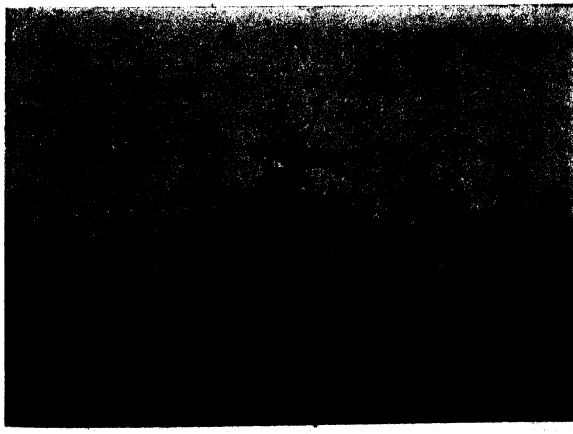

বিপরীতাভিমুখে টানিতে থাকে। তাহাদের একপক্ষকে "স্বর্গের দূত", অপর পক্ষকে "নরকের দূত" কল্পনা করা হয়। বলা বাহুল্য, তাহাদিগের হার-জিতের দ্বারা মৃতব্যক্তির পরলোকের স্থান পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পরন্তু এই আখ্যা নির্ব্বাচনে এমনি চাতুরী থাকে, প্রায়শই "স্বর্গীয় দূতের" জয় হয়। পূর্ব্বে এই রথ টানিবার নিমিত্ত বিবাহিত এবং অবিবাহিতদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। বর্ত্তমানে বিবাহিতের সংখ্যা অধিক হইয়া যাওয়াতে "গোছা" ভেদে অথবা নদীর বিপরীত-তীরবাসীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে। বলিয়া রাখা ভাল, এই সময়ে বাদ্য, বাজীপোড়ান প্রভৃতিও একান্ত প্রয়োজন।

শবদাহ।

শব সচরাচর দাহ করিয়া বিনষ্ট করা হয়। কিন্তু অমুদ্গতদন্ত শিশুশব ভূপ্রোথিত করাই সাধারণ বিধি। যদি কেহ তাদৃশ শবকেও পোড়াইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে মুখে কড়ি স্পর্শ করাইয়া জ্বালাইতে পারে। অপর বসন্ত, বিসূচিকাদি সংক্রামক রোগে মৃতদেহ প্রথমে ভূগর্ভে পুতিয়া রাখে; অনন্তর দুই তিন মাস পর সেই শব তুলিয়া যথানিয়মে জ্বালাইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এসকল ছোঁয়াচে রোগের শব সদ্য জ্বালাইলে, তথাবিধ রোগে হুতাশন প্রায় গ্রীষ্ম উৎসন্ন করিবে। ইহাদের শবদগ্ধ করিবার নিমিত্ত চুল্লীর প্রয়োজন হয় না। দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা গুঁড়ি স্থাপন করিয়া তদুপরি পুরুষের নিমিত্ত পাঁচ তবক এবং স্ত্রীলোকের সাত তবক সরু কাষ্ঠ সাজাইয়া লয় (১)। মধ্যে মধ্যে আম্রপ্রশাখাও দেওয়ার নিয়ম আছে, ধনশালী মহাশয়েরা তৎপরিবর্ত্তে চন্দনকাষ্ঠ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া এই চিতার উপরিভাগে একখানি চন্দ্রাতপ টাঙাইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর পুরুষের শব পূর্ব্বাভিমুখ এবং স্ত্রীলোকের শব পশ্চিমাভিমুখ মস্তকে চিতার উপর সংস্থাপিত করা হয়। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র তদভাবে অপর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মুখাগ্নি দান করিলে আরও অনেকে চতুর্দ্দিক হইতে অগ্নিসংযোগ করিয়া থাকে। এই সঙ্গে মৃত ব্যক্তির গৃহের একটি থাম, কি একটি বাঁশ বা যে কোন একটি অংশ পরজন্মের আশ্রয়ার্থ দগ্ধ করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্কের মৃত্যুতে প্রজ্জ্বালনকালেও বাদ্যোৎসবের প্রচলন আছে, অবস্থাপন্ন হইলে, বাঈ পোড়াইবারও ব্যবস্থা করা হয়। পরিশেষে দাহকার্য্য সমাধা হইয়া আসিলে "রড়িগণ" "ছাদিংগিরি তারা" পাঠ করেন। গর্ভাবস্থায় মরিলে আগে পেট চিরিয়া ভ্রূণ বাহির করতঃ, তৎপর জ্বালায়; এবং সেই ভ্রূণকে সমাধিস্থ করে (২)। আর যদি কেহ ভূতগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারায়, তাহা হইলে সেই শব অর্দ্ধদগ্ধ হইবার পর বক্ষের নিম্নে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলা হয়। সংস্কার আছে, নতুবা সেই ব্যক্তি

(১) মঘদিগের মধ্যেও স্ত্রীলোকের নিমিত্ত অধিকতর কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। চাকমাগণ তাহাদিগের হইতে ইহা অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু জানি না, ঈদৃশী ব্যবস্থার কোন্ বিশেষ রহস্য নিহিত রহিয়াছে। কাপ্তেন লুইনও এতৎপ্রসঙ্গালোচনায় লিখিয়াছেন—স্ত্রীলোকদিগের অধিকতর বৃদ্ধি এবং তৈলাক্ত পদার্থের আধিক্যনিবন্ধন দাহোপকরণের কম প্রয়োজন হইবার কথা, কিন্তু ইহারা তৎস্থলে আরও অধিকই ব্যবহার করে।

(২) এই প্রথা পার্ব্বত্য মঘ ও ত্রিপুরাদের মধ্যেও আছে, হিন্দুদের হইতে অনুকৃত অনুমান হয়। পরন্তু এই পেট চিরিবার ভার স্বামী তদভাবে দেবরের স্কন্ধেই পড়ে।

পুনরুজ্জীবিত হইয়া নানা অহিত সংঘটন করে। পুরাকালে আত্মহত্যাকারীদিগের প্রতিও ঈদৃশী ব্যবস্থা প্রদত্ত হইত। যাহা হউক, শব ভস্মাবশিষ্ট হইলে সমাগত সকলে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বলিয়া রাখা ভাল, এই ফিরিবার কালে তাহারা অতি সাবধান রহে।

হাড়ভাসান।—অন্ত্যেষ্টির পরদিন প্রত্যূষে চিতা হইতে কতকগুলি অস্থিমাত্র সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট ভস্মরাশি স্রোতোজলে নিক্ষেপ করে। অনন্তর সংগৃহীত হাড়গুলি (১) একটি হাঁড়িতে রাখিয়া মৃতব্যক্তির জনৈক সগোত্র তাহার মুখ বন্ধ পূর্ব্বক লইয়া সেই স্রোতস্বতীর জলে নামে। তাহার হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত বাঁধিয়া দেওয়া হয়; অপর প্রান্ত তাহার সম্পর্কে সম্মানিত সেই গোত্রেরই কেহ তীরভূমি হইতে টানিয়া ধরে। এদিকে চাপদ্বারা "হাঁড়ি"টা জলপূর্ণ হইলে ডুব দিয়া তাহা ঠেলিয়া দিতেই, তীরস্থিত ব্যক্তি জলগত ব্যক্তিকে সূতার আকর্ষণ তুলিয়া আনে। অতঃপর "রড়ী" ও "ঠাকুর"দিগকে দান-দক্ষিণা উৎসর্গ করা এবং পরিপাটিরূপে খাওয়ান হয়। এই সময়ে শ্মশানভূমিতে ঘেরা দিবারও ব্যবস্থা আছে।

সাপ্তাহিক।

শ্রাদ্ধ।—কোন কোন গোষ্ঠীতে অন্ত্যেষ্টির দিন হইতে সাতদিন পরে, আবার কেহ বা মৃত্যুদিবসের সাতদিন পরে সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করে (২)। এই আদ্যশ্রাদ্ধ-কার্য্য শ্মশানভূমিতেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সাধ্যায়ত্তরূপে ভিক্ষু ও শ্রমণগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। ক্রিয়াস্থলে প্রেতাত্মার প্রীত্যর্থে ধ্বজা, খট্টা, শয্যা, নানাবিধ বাসন ও মদ্য, অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্যাপ-করণ দক্ষিণাসহ উৎসর্গ করে। অনন্তর সপরিবারে কলসী ধরিয়া জল ঢালে; যদি পরিবারের কাহারও অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে সে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত ধরিয়া রহে, অপরপ্রান্ত দানভূমিতে আনিয়া উক্ত কলসীগলে জড়ায়। এই সময়ে সমাগত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা প্রেতাত্মার উদ্দেশে ধ্বজাপ্রতিষ্ঠা এবং 'দান খয়রাত' ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কথিত আছে, 'ধ্বজাদানের এতই ফল যে, তৎসঞ্চালনে শ্মশানের বতগুলি

(১) ধনাঢ্যগণ ইহা হইতে কয়েক খণ্ড অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপনার্থ রাখিয়া দেন।

(২) এ কয়দিন পরিবারস্থ সকলে প্রত্যহ সায়ংকালে "ফারক্" শ্রবণ করিয়া থাকে; তদুপলক্ষে শ্রোতৃগণের প্রত্যেকে এক যোড়া করিয়া বাতি জ্বালায়।

রেণু পরিচালিত হয়, মৃতব্যক্তি তত বৎসর নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গবাসের অধিকার লাভ করে।' সুতরাং ধনী সংখ্যায় বেশী হইলে স্বর্গবাসের সুবিধাও অধিক ঘটে। এতদুপলক্ষে ভোজাদিও যথাসাধ্য পরিপাটি হইয়া থাকে।

বার্ষিক।

ইহাদের সমাজে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবারও রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা অতি অল্পলোকেই করে। মৃত্যুদিবসের বাঙ্গালা তারিখ ধরিয়াই বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন গণনা করা হয়। ইহাতেও ভিক্ষু এবং শ্রমণদিগকে নানাবিধ দান ও দক্ষিণাদি উৎসর্গ ভিন্ন পূর্ব্বোক্তরূপে জল ঢালাও হয়; তা'ছাড়া অপর কোন বিশেষ বিধান নাই।

পিণ্ডদান।—ইহাকে সাধারণ কথায় "ভাত দেওয়া" বলা হয়। বৌদ্ধগণও পুনর্জ্জন্মবাদী। চাকমারা বলে, ইহলোকের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলানুসারে মানবগণ দেবযোনি হইতে কীট-পতঙ্গাদি তির্য্যগ্‌যোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। সুতরাং কামনা ও কর্ম্মফলে অনেকে পুনরায় মানবজন্মও গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা আবার পূর্ব্ববংশেও জন্মলাভ করে। কথিত 'পিণ্ডদান' দ্বারা একদিকে যেমন পূর্ব্বপুরুষের তৃপ্তি সাধিত হয়, অপর দিকে তাহারা বর্ত্তমানে কে কোথায় আছে—তাহারও অনেকটা সন্ধান লাভ হয়; এবং কেহ কেহ উদ্ধারও লাভ করে। আপনাপন গোষ্ঠিতে মাত্র পিণ্ডদান করিবার নিয়ম; সগোত্রজ যে কেহ "গোষ্ঠীর" সকলেরই উদ্দেশে পিণ্ডাদান করিতে পারে। পরন্তু কত পর্য্যায় পর্য্যন্ত পিণ্ডপ্রদান করা হইল, প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই তাহার একটা হিসাব থাকে। তিন, চারি বা অবস্থাবিশেষে ততোধিক পর্য্যায়ান্তর গোষ্ঠীর সন্ততিপন্ন ব্যক্তি এ হেন পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানে 'অশেষ পুণ্যার্জ্জন করে।'

এ উপলক্ষে সমুদয় জ্ঞাতিবর্গ, এবং তদংশোদ্ভবা বিবাহিতা ও বিধবাগণ তাহাদের সন্তানসন্ততি সমভিব্যাহারে আহূত হয়। নদীতীরে অপ্রাপ্তপিণ্ডক মৃত স্ত্রী ও পুরুষগণের নিমিত্ত বয়ঃক্রমানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দুই সমান্তরাল শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন কৃত্রিম 'শ্মশান' প্রস্তুত করে। 'শ্মশান' আর কিছুই নহে, বাঁশদ্বারা সীমাবদ্ধ কতিপয় ক্ষেত্র মাত্র। পূর্ব্বদিন সায়ং সময়ে সকলে উক্ত স্থানে গিয়া প্রেতাত্মাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে, তখন হইতেই কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হয়। সকলে গিয়া তাহাদিগকে আপনাপন পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষ সন্ধানে আহ্বান করিতে থাকে; যে পরিচয়ে সংজ্ঞালাভ হয়, সে-ই তথাকথিত ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বিশ্বাসে—তৎবংশধরগণ তাহার আকাঙ্ক্ষাপূরণে তৎপর হয়;

এইরূপে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে পরদিন "ঠাকুর" তদ্ভাবে "ঋত্বিগণ" তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বিশেষভাবে প্রস্তুত মঞ্চোপরি উপবেশন করিয়া, "মালেম," "স্ত্রীপুদরা," 'সুরাদিজা,' "পুতুমফুলু," "ফুহুমকুলু," "সাহসফুলু" এবং "দাসপারামি-তারা" পাঠ করেন। অনন্তর গৃহস্থ ও অপরাপর পিণ্ডদাতৃগণ গললগ্নী-কৃত-বাসে প্রত্যেক প্রেতাত্মার উদ্দেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "আধার" (১) এবং "মেজাং"এর উপরিস্থাপিত নবথালায় এক এক অর্দ্ধ দগ্ধমোরগ, কিছু কিছু শূকর-মহিষাদির মাংস ও ভাত, নারিকেল, কলা, মিশ্রি, গুড়, নানাবিধ মিষ্টান্ন, মদ্য প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন পুরোহিতগণ সমস্বরে উৎসর্গ মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। মন্ত্রপাঠকালে কোন "আধারের" উপর কীট-পতঙ্গাদি পতিত হইলে, সেই পাত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তি তথাপতিত তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। এসময়ে আবার জ্ঞাতি বা সমবেত কুটুম্বদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। তখন পিণ্ডদাতা সমুদয় পিণ্ডপাত্রসহ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া এক একজনের সম্মুখে এক একটি "আধার" আনয়ন করতঃ পাত্রোদ্দিষ্ট নামোল্লেখে বলিতে থাকে, "তুমি আমার অমুক (পিতা বা পিতামহ প্রভৃতি) হইলে, মদত্ত পিণ্ড গ্রহণ কর।" এইরূপে এক একটি পাত্র 'যাচাই' করিতে করিতে সেই মূর্চ্ছিত ব্যক্তি হঠাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু-রুন্মীলনপূর্ব্বক কাঁদিতে থাকে। যে পাত্রোদ্দিষ্ট নামে এই চৈতন্য সম্পাদিত হয়, সে মূর্চ্ছিত ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। অনন্তর যথাযোগ্য দান দক্ষিণাদিসহ তাহারই হস্তে তথাকথিত পিণ্ড অর্পিত হয়; পিণ্ড-গ্রহীতা তাহা হইতে স্বেচ্ছানুসারে উপাদেয় সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকে। তখন পিণ্ডদাতা তাহাকে (বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও), ভূমিগত প্রণিপাত করিয়া 'তুমি আমার অমুক (পিতা পিতামহ প্রভৃতি), এক্ষণে অমুক (পুত্র বা পৌত্র) রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আহা! স্নেহের কি অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ জন্মে জন্মেও আমাকে ভুলিতে পারিতেছনা,' ইত্যাদি নানা প্রিয়ালাপের সহিত সস্নেহ আলিঙ্গন করিয়া তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লয়। ক্রিয়াস্থলে জ্ঞাতিবর্গের সকলেরই উপস্থিত থাকিবার প্রধান প্রয়োজনীয়তা এই যে, তাহাদের কেহ যদি ভিন্ন স্থানে থাকিয়া এই পিণ্ডদানকালে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তদুদ্দিষ্ট পিণ্ডলাভ ব্যতিরেকে চৈতন্য লাভ ঘটে না, সুতরাং বিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনা। ইহারা

(১) "আধার"—পিণ্ডপাত্র; ক্ষুদ্র চুপ্‌ড়ী বিশেষ।

আরও বলে, পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে যদি কীট, পতঙ্গ, কুকুর, শৃগালাদি তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এই পিণ্ডদানমাত্র মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে। ব্যাঘ্র কুম্ভীর প্রভৃতির করালগ্রাসে বা জলমগ্ন কি উদ্বন্ধনাদিতে গতাসু ব্যক্তিগণও এই পিণ্ডলাভে উদ্ধার পাইয়া যায়। অতঃপর এইরূপে পিণ্ডপাত্রাদি লইয়া প্রাগুক্ত শ্মশানে উপস্থিত হয়; তথায় প্রত্যেক প্রেতাত্মার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পিণ্ডপাত্রাদি স্থাপনপূর্ব্বক পার্শ্বে প্রত্যেক প্রেতাত্মার উদ্দেশে নানা কারুকার্য্য সমন্বিত এক একখানি সূত্র ও বস্ত্র "টাঙ্গোন" প্রবাহিতা নদীকূলে বিলম্বিত ও দক্ষিণাউৎসর্গ করে। মৃদু মন্দানিলে সেই ধ্বজানিচয় সঞ্চালিত হইয়া অনুষ্ঠাতার অক্ষয় পুণ্য ও যশোঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যত ধূলিকণা স্থানান্তরিত করে, প্রেতাত্মা তত বৎসর স্বর্গসুখভোগ করিতে পায়। বিগত ১৩১৫ সালের ২রা ফাল্গুন ফেমাছরাবাসী শ্রীজয়চরণ খিসা নামা কুরাকুট্যা গোছার সুরেশ্বরী গোষ্ঠীজ জনৈক চাকমা যে পিণ্ডদানোৎসব করে, তাহাতে ১৮০ জন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদত্ত হয়। তাহাদের গোষ্ঠীতে ৮০ পরিবার। এই কার্য্যে তাহার প্রায় সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

[১] প্রাচীন সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ ধারণা ;

ও

[২] প্রবাদ বাক্য (Proverbs.) ।

[১]

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির ভিতরেই ন্যূনাধিক পরিমাণে কতিপয় সংস্কার এযাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর প্রদীপ্ত সভ্যতালোকেও তৎসমুদয়ের উচ্ছেদ সাধন করা যাইতেছে না! অনেকে বিশেষতঃ নব্য যুবকেরা বলিয়া থাকেন, এই সকল সংস্কার জাতীয় দুর্ব্বলতা হইতে সঞ্জাত।

সংস্কার।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহারাই আবার বয়সাধিক্য এবং শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল 'কুসংস্কারের' ভক্ত হইয়া পড়েন। এরূপ দৃষ্টান্ত সমাজে প্রায়শঃই ঘটিতে দেখা যায়। এমন কি ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যৌবন-মদ-দৃপ্ত উদ্ধতাচারী কোন কোন যুবক পুরুষ পরম্পরাগত সংস্কারের মস্তকোপরি পদাঘাতে নানা উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটাইয়াও হঠাৎ দৈবশক্তির সামান্য আঘাতেই এত যে কাতর হয়, অতি সত্বরেই বরাকৃষ্ট অশ্বেরন্যায় অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে নতশির হইয়া পড়ে! যাহা হউক, মধ্যযুগে সমাজবিপ্লব যাদৃশ ভীষণ ভাবে গড়াইতেছিল, সুখের বিষয়, এক্ষণে তাহা আর নাই। ঝড় থামিয়াছে,—স্রোত ফিরিয়াছে—দেশের লোকের মতি-গতিও প্রাচীনকে সম্মান করিতে ছুটিয়াছে।

পক্ষান্তরে ইহা সত্য যে, এ সমুদায় সংস্কারের উপর অত্যাচার করিলে ফল না হইয়া যায় না। হয়তঃ কোনটা স্থূল দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে, অথবা কোনটা পরোক্ষ-

ফল।

ভাবে তেজোবিকাশ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। তবে সংস্কারগুলি যেরূপ ভাবে ধর্ম্ম ও অমঙ্গল-পাশে বিজড়িত, সেই সমস্ত কি পরিমাণে যে সারগর্ভ—তাহাই সন্দেহের বিষয়। যতদূর সম্ভব, সাধারণকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই

তাদৃশী গর্হিত যুক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। তৎপরিবর্ত্তে সরল ভাবে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গেলেই আশা করি এই কঠোর বৈজ্ঞানিক যুগে অধিকতর আদৃত হইত। তবে পরিণাম সমালোচনা না করিয়া পূর্ব্বপুরুষের বহুদর্শিতা-প্রসূত উপদেশ-জ্ঞানে অন্ধ বিশ্বাসেই সংস্কারগুলি প্রতিপালন করিয়া যাওয়া মন্দ নহে।

সংস্কার চেষ্টা।

অধুনা চাকমাদিগের মধ্যেও 'সংস্কার' সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে। এখানেও শিক্ষিতাভিমানী নব্য যুবকেরাই তাহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহের বিষয়। কেননা সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই সমস্তের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় ভক্তিমান যে, তাহারা সহজে বিচলিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য সমাজের যে কোনও অনিষ্ট ঘটিবে, সেই আশঙ্কাও নাই। বরং সকলে 'সংস্কারের' তাড়নাতে হইলেও কর্ম্মে ব্রতী হউক, তাহাই আমাদের প্রার্থনা।

তালিকা।

কোন সমাজের যাবতীয় সংস্কারগুলি তালিকাবদ্ধ করা কখনই সম্ভবপর নহে। কেবল নমুনা প্রদর্শনের নিমিত্ত চাকমা জাতির কয়েকটী মাত্র সংস্কারের উল্লেখ করা গেলঃ—

অমঙ্গলসূচনা।

শব্দে।—রাত্রিকালে কাক বা ঘুঘু এবং অপরাহ্ণে মোরগের ডাক অশুভ সূচনা করে। কুকুরীর উচ্চশব্দ যে কোন সময়ে অমঙ্গলজ্ঞাপক। শুষ্কবৃক্ষে খঞ্জন ডাকিলেও অশুভ ঘটে।

দৈবযোগে।—রাত্রে টিয়াপাখী উড়িলে দেশ ছাড়খারে যায়। মোরগে নয়ম ডিম পাড়িলে গৃহস্থের অশুভ সূচিত হইয়া থাকে। "কেরা কাপড়" অর্থাৎ গাবছা ভাসিয়া গেলেও অমঙ্গল।

পশুপক্ষীদ্বারা।—আদমে বানর ঢুকিলে কিম্বা বাঘ ঘরে ঢুকিয়া "ভাতের মোচা (পুটুলী)" খাইলে ভাল নহে। গৃহের মধ্যে মৌমাছি প্রবেশ করিলে সবংশে বিনাশ নিশ্চিত। ঘরের মধ্যে অপরের ছাগল উঠিলে, অতিথির আগমন সূচনা করে। যদি "মইন ঘরে" গিয়া বাঘ উঠে, তাহা হইলে পরিবারের সকলেরই "বাঘা ধোওয়া" আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন ঘরের চালে চিল, পেচক, শকুনী বা গৃধিনী

পড়িলে অথবা কুকুর উঠিলে অশুভ জ্ঞাপন করে। তজ্জন্য যথাসম্ভব সত্বর পূজার আয়োজন করা হইয়া থাকে। কেবল শেষোক্ত স্থলে কুকুরের কান কাটিয়া দেওয়া হয়; এবং সপরিবারে "মাথা ধোয়।"

যাত্রাকালে।—খালী কলসী দেখিলে অমঙ্গল ঘটে, পূর্ণ কলসী দেখা গেলে কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চিত। হাঁচি পড়িলে ভাল নহে; কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যাওয়া প্রয়োজন। সর্প বা শৃগাল দক্ষিণ হইতে বামে গেলে কুলক্ষণ সূচনা করে, বিপরীতে শুভ। মস্তকে আঘাত পড়িলে অশুভ; ইহাতেও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। যদি বন্য কুক্কুট ডাকিতে ডাকিতে কাহারও অভিমুখে আসে, তাহাতেও অমঙ্গল সূচিত হয়। সর্প দক্ষিণ হইতে বামদিকে গেলে অযাত্রা, কিন্তু বাম হইতে দক্ষিণ দিকে গেলে শুভ ঘটিবার সম্ভাবনা। বিবাহের প্রস্তাবার্থ গমন সময়ে যদি কোন জীবের শব দেখা যায়, তাহা হইলে সেস্থলে বিবাহ প্রস্তাব পরিত্যাজ্য।

নিষেধ ব্যবস্থা।

বারবিশেষে।—বুধবার কোন প্রধান কাজ করিতে নাই। এমন কি বাড়ী হইতে কোথাও যাত্রা করাও নিষিদ্ধ।

পানভোজনে।—বিড়ালের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ, কুকুরের পানাবশিষ্ট বা যে "কোত্তির" জলে পা ধোওয়া হয়, অথবা যে কূয়ার জলে লোকে স্নানটুকরে তাহার জলপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বর্ষাধিক্যকালেরও ছিমগাছের ছিম ভক্ষণে সর্পবিষ অনিবার্য্য হয়।

ক্রীড়ায়।—কাঁকড়া লইয়া খেলা নিষেধ। কীট লইয়া খেলা করিলে বজ্রপাত ঘটে।

স্পর্শে।—চলিবার সময় সন্তানের গায়ে বিশেষতঃ মস্তকে "পিঁধন" লাগিলে, সন্তানের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। সোনা, রূপা, চাউল প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধন সামগ্রী পায়ে লাগা ভাল নয়। যদি কোনরূপে পাদস্পর্শ ঘটে, তবে তখন তখন তাহা মস্তকে স্পর্শ করাইবে।

আচার-ব্যবহারে।—জলে প্রস্রাব করা, এবং তামাক সেবনের পর মুখ ধোওয়া নিষেধ। পক্ক বেগুনের ঘ্রাণ লইলে নাক পঁচিয়া যায়। পুরুষে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিলে বাজমুখে প্রাণ হারাইয়া থাকে। প্রত্যূষে মেঘ উঠিবার পূর্ব্বেই উনানের

ছাই ফেলিয়া না দিলে পরে সেই ছাই আর মাটিতে ফেলা যায় না; তাহা অপর কোন পাত্রে উঠাইয়া রাখিতে হয়। দ্বিপ্রহরের পর মঞ্চ পরিষ্কার কিম্বা উনান লেপাদি কাজ করিতে নাই। খালে নিয়া—মাটির হাঁড়ী, ঘর লেপিবার "নাতা" প্রভৃতি ধোওয়া ভাল নয়। জ্ঞাতির কেহ যদি নূতন কোনও নিয়ম বা কার্য্য আরম্ভ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই জ্ঞাতির অপর কাহারও তাদৃশ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিশেষ বিধি।

উপবেশনে।—কোন স্থানে বসিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ 'থুথু' প্রক্ষেপ না করিলে মার্গদেশ ভারী হইয়া "পুনথোড়া" রোগে কষ্ট পাইয়া থাকে।

দোলা প্রস্তুতে।—প্রথম জাত সন্তানের জন্য দোলা প্রস্তুত করিতে পারা যায়; কিন্তু অনুজাত আর সমুদয় পুত্র কন্যাকে তাহাতেই দোলাইতে হয়। নতুবা পরবর্ত্তী, কাহারও নিমিত্ত নূতন দোলা প্রস্তুত করিলে, সেই সন্তানের মৃত্যু ঘটে।

বিষম লাগিলে।—পানাহার করাইবার সময় যদি হঠাৎ শিশু সন্তানের শ্বাসরোধ ঘটে, তাহা হইলে মাতা এক শব্দ করিতে করিতে আস্তে আস্তে সন্তানের মস্তকে করাঘাত করিয়া থাকে।

গোষ্ঠীবিশেষে।—"পিড়া ভাঙা" গোষ্ঠী মিষ্টকুমুড়ের বীজ বপন করিতে পারে না; তাহার অন্যথা করিলে তাহাদের ক্ষেত্রে বাঘ আসে এবং উপদ্রব করে। "কোমরেং" ও "কাল" গোষ্ঠী লাউ কুমুড়াদির নিমিত্ত 'মাচা' দিতে পারে না। "সিঙিয়া পুনা" গোষ্ঠি কিছু উত্তাপে রাখিবার জন্য 'মাচা' দিলেও অমঙ্গল ঘটে। "নানুকৃতুয়া" গোষ্ঠির সেরী, আড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন কচুরোপণেও তাহাদিগের বাধা আছে। এইরূপে কোন কোন গোষ্ঠী মানকচু খাইতে এমন কি ছুঁইতেও পারে না। কাহারও বা পেচক ধরা উচিত নহে।

শূকর কাটিলে।—"আদমে" শূকর কাটিলে বালকবালিকাদিগের নাকে, বগলে এবং কনুই ও জানু প্রভৃতিতে কাঁচা হলুদ বাটিয়া দেওয়া হয়, নতুবা তাহারা অপদেবতা হইতে ভয় পাইতে পারে।

সর্পহত্যায়।—সাপ মারিলে মাথা ও লেজ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখে; তা'না হইলে সেই সর্পের পুনর্জ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা রাখে।

শব সংকারে।—যাহারা বাঘের "ফু" অর্থাৎ মন্ত্র জানে, মৃত্যুর পর যদি

তাহাদিগের শব অবিলম্বে পোড়াইয়া না ফেলে, তবে তাহারা পুনর্জ্জীবিত হইয়া মানুষ ধরিয়া খায়। এমন কি, শত শত খণ্ড করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিলেও রাত্রে আবার সমস্ত একীভূত হইয়া উৎপাত আরম্ভ করে। সেই জন্য এইরূপ শবের তালু এবং উদরে লৌহ প্রেক প্রোথিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা অতি উত্তম প্রতিষেধক। লৌহ সংসৃষ্ট জিনিষের উপর ভূতপ্রেতের অধিকার থাকে না। অতএব এ সকলের হাত হইতে নিরাপদ থাকিতে হইলে লৌহের কোন দ্রব্য সঙ্গে রাখিতে হয়।

স্বপ্নফল।

যদি স্বপ্নে শিকার লব্ধ কোনও প্রাণীভোজন করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে অচিরে মৃত্যু ঘটে। স্বপ্নে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়াছে দেখা গেলে, অপমানিত হইতে হয়। স্বপ্নে মৎস্য প্রাপ্তিতে অর্থলাভ হইয়া থাকে। মৃতলোককে স্বপ্নে দেখিলে পরদিন মাংস খাইতে নাই, নতুবা অনিষ্ট ঘটে। স্বপ্নে "চামনী" (দীক্ষা) হইতেছে দেখা ভাল নহে; চুল ছাটিতে দেখাও ভাবী অমঙ্গল-জ্ঞাপক। যদি কেহ স্বপ্নে স্রোতের অনুকূলে নৌকা যাইতে দেখে, তাহাতে অমঙ্গল হয়; প্রতিকূলে যাইতে দেখিলে শুভ ঘটিয়া থাকে।

বিবিধ।

শনি মঙ্গলবারে চিংড়ি মৎস্যের জন্ম হয়, সুতরাং ঐ সকল দিনে চিংড়িমাছ অধিক সংখ্যায় ধরিতে পারা যায়।

গ্রহণের কারণ নির্দ্দেশে কথিত হয়, "চন্দ্রসূর্য্য কোন সময়ে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া রাহু হইতে কিছু ধার নিয়াছিল; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলেও, তাহারা তাহা পরিশোধ করিতে পারে নাই। তদবধি তাহারা রাহুকে দেখিলেই 'পাশ কাটিয়া' পলায়ন করে। রাহু ইহাতে কোপ-পরতন্ত্র হইয়া বিশ্বাসঘাতক-গণকে সুবিধামত পাইলেই উদরসাৎ করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহারা মলদ্বার দিয়া পলাইয়া যায়।' এই কারণে গ্রহণসময়ে ইহারা বন্দুকের আওয়াজ করিতে থাকে। অন্ততঃ উল্কাপাতকেও ইহারা কোন অমঙ্গলের চক্ষে দেখে না। ইহাদের মতে 'এক তারা অপর তারার বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায়'—মাত্র। তাই তাহা ইহাদের ভাষায়—"তারা জামাই"।

অনেক সময় এই দেশ ইন্দুরের উপদ্রবে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পালে পালে ইন্দুর আসিয়া, সম্মুখে যাহা পায়—লুটিয়া যায়। তাহারা ক্ষেত্রের শস্যও নষ্ট করে

এবং হতভাগ্য পাহাড়ীদের ধানের গোলাও শূন্য করিয়া ফেলে। পরন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতেই অন্তর্ধান হয়! কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন (১), "গত ১৮৬৪ অব্দে যখন ইন্দুরের উৎপাত আরম্ভ হয়, তখন পাহাড়ীরা আমাকে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল যে, এই সকল ইন্দুর কালে বন্য কুক্কুট হইয়া থাকে।" প্রমাণ স্বরূপ তাহারা, বন্যকুক্কুটের লম্বা পালককে যাহা মাটি ছেঁচ্‌ড়াইয়া যায়, ইন্দুর জন্মের লেজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল।"

[২]

প্রবচন।

সমাজে আর কতিপয় গাথা থাকে, তৎসমুদয় বহু অভিজ্ঞতা প্রসূত, সুতরাং অমূল্য উপদেশে পরিপূর্ণ! সহস্র ব্যাখ্যা বা বক্তৃতায় যাহা সম্ভব নহে, এই এক একটি মাত্র উপমামূলক সতর্কসত্যে তদপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ততার সহিত মনের উপর প্রবল আঘাত করিয়া থাকে। আমরা যদি এই মহা বাক্যগুলি হৃদয়ে চির জাগরূক রাখিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কখনও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দৈববাণী উত্থিত হয়; তাহার সুগম্ভীর নির্ঘোষে ভাবী ফলাফল জানিতে পারিয়া উপযুক্ত সময়ে সাবধান হইতে পারি। অতীব দুঃখের বিষয়, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার বড় একটা সংবাদ রাখেন না। তাঁহারা দুই চারিটী বিজাতীয় 'ইডিয়ম' (Idiom) শিখিলেই জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর হইল, চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ এণ্ডার্সন কতিপয় "চট্টগ্রামের প্রবাদ বাক্য" (Chittagong Proverbs) উদ্ধার করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। লিখিতে লজ্জা ও ক্ষোভে লেখনী নত হইয়া যায়,—আধুনিক অনেক স্বদেশবাসী তাহা পাঠেই দেশের প্রবচন শিক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা হউক এক্ষণে তৎপ্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আশা হয়, বুঝি বা দিন ফিরিল। সুতরাং প্রত্যেক দেশের সহযোগী সাহিত্য সেবকগণকে এই জন্য অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব দেশের এতাদৃশ কর্ত্তব্যানুশাসন বচন নিচয় অতীতের ঔদাসিন্য হইতে রক্ষা করিতে যত্নশীল হন। চাকমা সম্প্রদায়ে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়ের কিয়দংশ বিজাতীয় ভাবে গঠিত, কোন কোনটী কেবল ভাষান্তরিত মাত্র। এস্থলে কেবল ইহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব কয়েকটী প্রবচন প্রদত্ত হইল।

(১) The Hill Tracts of Chittagong and the dewellers therein. P. 12.

"বড় পণ্ডিত হলে পথর কুরে হাগন।"১।

"আপন আন্দাজ্ পাগলে বুঝে।" ২।

"উয়রে উয়রে ব-যায়,
কলগ-মান্‌জে থান্ নপায়।" ৩।

"একা বুদ্ধি যার, গুণৎ দরি তার;
ছেত্তেরা বুদ্ধি যার,পুনৎ দরি তার।" ৪।

"কুকি দেজৎ নুন যেচেদে হয় ?"৫।

"কেন্যায় তুষ গরে, মাল্যা কাবা খায়।" ৬।

"খেইৎ ন জান্নে মরি পায়,
বইৎ ন জান্নে লরি পায়।" ৭।

"গরম ভাতে ক্ষুধা বেজার।" ৮।

"গাজর আগাৎ গুই,
থুরা ভাৎ খেযা তুই।" ৯।

"গিরিগুণে শূকর ফাট্টোয়া হয়।" ১০।

"শব্দ হুনি গোয়ালপারা,
দৈ-দুধ ছেত্তেরা।" ১১।

"চিলর দরে কি কুরা ন পুজিব ?"১২।

"ছাগল দিলে দরি নদিলে।" ১৩।

"তুই বাঙাল ছাগল হইয়চ্ছে ?" ১৪।

"তুচ্ খলাৎ কুরা-আক্যাং ইহয়ে।"১৫।

"নামু নচিনি ছালাম্ গরন।" ১৬।

১। অত্যাধিক পবিত্রাচারী লোকেরা পথের ধারেই বাহ্য করে, অর্থাৎ যাহারা বেশী সাঁটি দেখাইতে চায়, তাহাদের গলদ খুব বেশী।

২। নিজের ভাল পাগলেও বুঝিতে পারে।

৩। বাতাস উপর উপর দিয়াই প্রবাহিত হয়, গিরিগহ্বরবাসীরা তাহা অনুভব করিতে পায় না।

৪। যাহার একমাত্র বুদ্ধি অর্থাৎ, এক বিষয়ে মাত্র জ্ঞান, সে (নৌকার) "গুণ দড়ি"র ন্যায় কার্য্য চালাইয়া থাকে। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অত্যধিক, তাহার মার্গে দড়ি পড়ে; অর্থাৎ সে রজ্জুবদ্ধ হয়। c/০ "অতি চালাকের গলায় দড়ি।"

৫। কুকিদেশে লবণ (অর্থাৎ যেখানে যাহার বিশেষ অভাব) যাচ্ঞা করিতেছে!

৬। দুশ্চরিত্র পাপ কার্য্য করে, নপুংসক তাহার শাস্তি ভোগ করে। অর্থাৎ একে দোষ করে, নির্দ্দোষ তৎশাস্তি পাইয়া থাকে।

৭। খাইতে না জানিলে মরিতে হয়, এবং বসিতে না জানিলে নড়িতে হয়।

৮। ক্ষুধার সময় গরম ভাত দেওয়া হইলে ক্ষুধা লোপ পায়, অর্থাৎ উচিত ব্যবস্থায় সকলেই বিরক্ত হয়।

৯। গাছের অগ্রভাগে গোসাপ রহিয়াছে; (অথচ ভাইপো পিতৃব্যকে বলিতেছে) খুড়া, (উক্ত গোসাপ দিয়া) ভাত খাইয়া যাও।

১০। গৃহস্থের প্রকৃতি অনুসারে শূকর অমিতাচারী হয়।

১১। গোয়ালপাড়ার শব্দ শুনিয়া, দৈ-দুধ পর্য্যাপ্ত মনে করা।

১২। চিলের ভয়ে কি মোরগ পুষিব না? c/০ 'চোরের ভয়ে বিবাহ না করা।'

১৩। ছাগল দিলে, তার দড়ি দিলে না?

১৪। তুই বাঙ্গালীর ছাগলের ন্যায় (সর্ব্বদা গা-ঘেঁসা) হইয়াছিস।

১৫। তুষ-ভাণ্ডার লোভী মোরগের ন্যায়।

১৬। ঠাকুরদা অর্থাৎ পূজনীয়কে না চিনিয়া সেলাম করা।

"নূন খেই গুণ গরন।" ১৭।

"পেকোয়াও পরিবার গং,
ধিলাবোয়াও ভাঙিবার গং।" ১৮।

"ফকির লগে কাল বাঙাল,
হরিণ লগে চঙরা পাগল,
খঞ্জন সমারে চেগা পাগল।"১৯।

"ফুল-বারি গায় ন সয়,
চাবুক-বারি পরাণে মাগের।" ২০।

"বকা ছেরে কবা।" ২১।

"বর গাংর চাইয়ম্,
খাদীও ধুইয়ম্।" ২২।

"বিলেলৈ কুগুর।" ২৩।

"বুরা বাঁদরে গাছৎ উডে।" ২৪।

"ভাত নেই গর্ পিদা।
উলু পারা চুল-ঝুরা।" ২৫।

"মইলায় গাছ কাবদে,
ভাগিনায় নরম পায়।" ২৬।

"মাণিক্যা-ব্যাপর ছুরিখানা।" ২৭।

"মানুজ্ বুঝি পুগিয়ে কামরায়।" ২৮।

"মুরা-উয়রে তুগুন বাচ্।" ২৯।

"যা-নাঙে ন্যোই,
মেজ্বাস্তা ঘরৎ গেলেও ন্যোই।"৩০।

"যার বাপরে কুমুরে খায়,

১৭। নিমক খাইয়া উপকার করা।

১৮। পক্ষিটী পড়িতেই ডালটী ভাঙিয়া গেল। c/o 'কাক তালিয়।'

১৯। বাঙ্গালীরা সর্ব্বদা ফকিরের পেছনে পেছনে থাকে। সেইরূপ ছোট হরিণীর সহিত বড় হরিণ এবং খঞ্জনের সঙ্গে চেগা নামক পক্ষী পাগলপ্রায় ঘুরে।

২০। ফুলের আঘাত সহ্য হয় না; চাবুকের আঘাত প্রাণে চায়।

২১। বকপালের মধ্যে যেমন কাক, অর্থাৎ 'হংসোমধ্যে বকো যথা'।

২২। বড় নদীও দেখিব, "খাদী"ও ধুইব। c/o 'রথ দেখা ও কলা বেচা।'

২৩। বিড়ালের সহিত (যেন) কুকুর—ইহাদের সর্ব্বদাই ঝগড়া বাধে।

২৪। বুড়া বানরও গাছে উঠিয়া থাকে।

২৫। ভাত খাওয়ার চাউল নাই, (হুকুম হইতেছে)—'পিঠা কর'। (অন্ততঃ তৈল অভাবে) চুলের খোপা উলু অর্থাৎ সরু ছনের প্রায় হইয়াছে।

২৬। মামা গাছ কাটিতেছে, ভাগিনেয় জানিতেছে যে—নরম।

২৭। 'মাণিক্যর বাপ' নামক এক ব্যক্তি সিন্নির নিমন্ত্রণে যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় কিছু পাইয়াছিল না। তদবধি তাহার ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোককে উক্ত প্রবচন দ্বারা ঠাট্টা করা হয়।

২৮। মানুষের প্রকৃতি বুঝিয়াই পুঁই নামক কীটবিশেষে কামড়ায় অর্থাৎ নিরীহ পাইলে ক্ষুদ্রও জ্বালাতন করে।

২৯। পাহাড়ের শৃঙ্গোপরিস্থিত তুগুণ বাঁশ অর্থাৎ ঝাড়ে একমাত্র বাঁশের ন্যায় বায়ুর অনুসারী—বিবেকসম্মানহীন ব্যক্তি।

৩০। যার জন্ম নাই, তার নিমন্ত্রণ বাড়ীতেও নাই।

তার পোয়ায় খেউ দেলে দরায়।" ৩১।

"যে ফুল নিন্দে, সেই ফুল পিঁধে।" ৩২।

"যেই কুগুরের লেজ বেঙা,
চুমাৎ ভোয়েলেও উজু নহয়।" ৩৩।

"যেমন তান্যাবি সেমন নাম,
সামুলেজী পিঁধন্নান্।" ৩৪।

"লুর-শূয়র চাল-উপর উধিলে,
ঘুগ্‌ঘুগি ডাঙর হয়।" ৩৫।

"ধায়দে মাচ্ছোয়া দাঙর,
মরেদে পুয়াবুয়া দোল্।" ৩৬।

"ছুকুরে কুচু-টেঙেরা ছুপ্ পেলে—
ন এরে।" ৩৭।

"সভামধ্যে কর্গরা ভাত।" ৩৮।

"সময় থাকৃতে বান;
দিন থাকৃতে হাঁট।" ৩৯।

"সাত ওঝায় পোয়া মারে।" ৪০।

"ছেদাম্ নেই ভেদাম্
মৈনর উপর তিন আদাম্।" ৪১।

"ছেদাম্ নেই ভেদাম্ নেই এত্তুমা হা,
গাং কূলে নি ভিজেই ভিজেই খা।" ৪২।

"ছেদাম্ নেই যার, তিন মোগ্ তার।" ৪৩।

"হেইদ্ এলে গাজ্ তগাতুগি।" ৪৪।

৩১। যার বাপকে কুমীরে খায়, সে ঢেউ দেখিলেও ভয় পায়।

৩২। যেই ফুলকে নিন্দা করা হয়, সেই ফুলই পরিশেষে পরিধান করে।

৩৩। যেই কুকুরের লেজ বাঁকা, চুঙায় ভরিলেও তাহা সোজা হয় না।

৩৪। তান্যাবিবি যে রকম, তার নামও তেমনি; তার পিঁধনখানিও "সামুলেজী" ফুল বিশিষ্ট ছিল।

৩৫। খোঁয়ারের শূকর চালের উপর উঠিলে গর্জ্জন বাড়ে।

৩৬। যে মাছটী পলাইয়াছে, তাহা খুব বড় ছিল; যে ছেলে মরিয়াছে, সে বড় সুন্দর ছিল।

৩৭। শূকর যদি কচুর ঘেরার অর্থাৎ কচু-খেতের সন্ধান পায়, আর ছাড়ে না।

৩৮। সভার মধ্যস্থলে পান্থাভাত, অর্থাৎ এক বিষয়ের আলোচনার সময় অন্য বিষয়ের উত্থাপন।

৩৯। সময় থাকিতে বাঁধ; দিন থাকিতে হাঁটিতে থাকে।

৪০। সাত ধাত্রীতে সন্তান নষ্ট করে।

৪১। বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই, অথচ পাহাড়ের শৃঙ্গে তিন পাড়া বসাইতে চায়।

৪২। বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই—'হাঁটী এত বড়; নদীর কূলে নিয়া ভিজাইয়া ভিজাইয়া খাও। অর্থাৎ নিষ্ঠাহীন আশায় কোন ফল নাই।

৪৩। যার বুদ্ধি সুদ্ধি নাই, তার তিন স্ত্রী। অর্থাৎ সে এক স্ত্রীতে ঘর চালাইতে পারে না।

৪৪। হাতী আসিয়া পড়িলে, তখন (তাহাকে মারিবার জন্য) গাছের অনুসন্ধান হয়।

"হেইদ-পুনৎ কুগুরে ভুগে।" ৪৫।

"ফেরা খেইয়া বাঘ-দরে খেই যাদে,
চিংখেইয়া বাঘ-লাগৎ পায়।" ৪৬।

"চিগন মরিচ-ঝাল বেচ্।" ৪৭।

৪৫। হাতীর পেছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। অর্থাৎ কেহ কেহ অপ্রাকৃত সাহসও প্রদর্শন করে।

৪৬। মাংসভুক্ বাঘের ভয়ে পলায়ন করিতে হৃদ্‌পিণ্ডভুক বাঘের সম্মুখে পড়ে।

৪৭। ছোট লঙ্কার ঝাল বেশী।

"খের-তলেও সোনা থায়।" ৪৮।

"রাদা ন্নেই দেজৎ,
কুরিড় গবৃগবি।" ৪৯।

"গাজ চিনে বাগলে,
মানুছ্ চিনে আগলে।" ৫০।

৪৮। খড়ের তলায়ও সোনা থাকিতে পারে।

৪৯। যে দেশে পুং-মোরগ নাই, তথায় স্ত্রী-মোরগের শব্দই বড়।

৫০। বাকল দেখিয়া গাছ চেনা যায়, এবং আচরণ দেখিয়া মানুষ চেনা যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আহার্য্য ও পানীয়।

প্রধানতঃ দেশের প্রকৃতিভেদেই খাদ্য ও পানীয়ের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। শীতপ্রধান এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশ কখনই একই নির্দ্দিষ্ট তালিকাধীনে চলিতে পারে না। একস্থানে মদ্যমাংসাদি উষ্ণতর ভক্ষ্য না হইলে আত্মরক্ষা কঠিন হয়, অন্যস্থানে শাকান্ন ভোজনেই যথেষ্ট হয়। সুতরাং যে স্থানে যাহা অনাবশ্যক—তাহাই অখাদ্য, রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একবারে অস্পৃশ্য; অথচ তাহাই অন্যস্থানে জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন। ইহা হইতেই জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা আসে এবং ধর্ম্মাচর্য্যার স্থূল ব্যবস্থাগুলিও নানারূপে পৃথগীকৃত হইয়া পড়ে। পরন্তু যদ্দ্বারা শরীররক্ষার সাহায্য হয়, তাহা সকল দেশের সকল জাতিরই ধর্ম্মানুমোদিত! প্রথমে শরীর পরে ধর্ম্ম,—ইহাই পণ্ডিতবর্গের মত (১)। অতএব আবশ্যক ও সৌকর্য্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভিন্নবিধ ভোজ্য প্রচলিত থাকিতে পারে, তাহাতে নিন্দার কোনও কথা নাই।

খাদ্যবিচার।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভেদে খাদ্যবিচার যেমন স্বাভাবিক, পক্ষান্তরে তাহার আহার পদ্ধতিও বিভিন্নরূপ হইয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে "কাঁটা-চামিচ" না হইলেই নয়, আর আমাদের দেশে একমাত্র হাতেই কাজ চলে। ইহাতেও আবার কেহ বা ডান হাতে কেহ বা বাম হাতে (২), কেহ কেহ বা উভয় হাতে, কি যেকোন হাতে আহার করে। চাকমাগণও এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে সাধারণতঃ ইহারাও

আহার পদ্ধতি।

---

(১) "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"—কুমারসম্ভব।

(২) ডাক্তারগণের মতে যে হাতে জলসৌচ করা হয়, খাদ্যদ্রব্যে তাহা স্পর্শ না করাই কর্ত্তব্য; কেন না তাহাতে কৃমিডিম্ব থাকে। এই ডিম পুনরায় কোনরূপে শরীরাভ্যন্তরে ঢুকিতে পারিলে ফুটিয়া যায়।

দক্ষিণ হস্তেই গ্রাস গ্রহণ করে এবং বামহস্ত মৎস্যের কাঁটাদি ছাড়াইতে সাহায্য করিয়া থাকে। বলিতে কি, ইহাদেরও উচ্ছিষ্টে অশুচিত্ব সংস্কার নাই (১)। নিমন্ত্রণাদিতে বা প্রীতিভোজে সতরঞ্চ তদভাবে কেবল "পাটী" বিছাইয়াই আহারে বসে; নতুবা সচরাচর সকলে "পিড়ি"তে বসিয়াই আহার করিয়া থাকে। কিন্তু ধনবান মহাশয়েরা আহার কালে ধাতুজ "ভোজন বেড়ের" (২) উপর থালা রক্ষা করেন; আর সাধারণ পরিবারে "ভোজন বেড়" অভাবে বাঁশের চ্যাচাড়ী নির্ম্মিত "মেজাং" (৩) এর উপর থালা, মৃণ্ময় বাসন কিম্বা কদলী পত্রে ("পৈ"এ) ভোজন করিয়া থাকে। "পৈ" চিৎ করিয়াই পাতা হয়। ভাতের মধ্যে মধ্যেই "তৈন" অর্থাৎ ব্যঞ্জন লয়; সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাটীর ব্যবহারও আছে। ইহাদিগের সচরাচর প্রচলিত খাদ্য ও পানীয়ের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

চাউল—আতপেরই প্রচলন অধিক; সিদ্ধ একরূপ নাই বলিলেও হয়। পাহাড়ী চাউলে তৈলের ভাগ কিছু বেশী এবং অধিকাংশই মোটা। কিন্তু ইহারা চাউলগুলি এমনি ছাটিয়া খায় যে, সহসা দেখিলে মোটা চিকণে প্রভেদ বুঝা যায় না। তত অধিক পুরাতন চাউল মাত্রই পছন্দ করে না। এমন কি তৈলাক্ত হইলেও নূতন চাউলই খায়; এবং বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত ধান বিক্রি করিয়া নূতন খরিদ করে।

দাল—খুব কম প্রচলিত; নিমন্ত্রণাদিতে বা ভদ্রপরিবারে মাত্র সময়ে সময়ে দেখা যায়। কিন্তু শিমের বীজের দাল ইহারা অতিশয় ভালবাসে।

শাক—নানা রকমেরই আছে; তন্মধ্যে এই কয়টীই সমধিক প্রচলিত। উচ্ছে শাক, "লেলাং শাক," "উজন শাক," ঢেঁকি শাক, "মাইয়া শাক," কচু শাক, "লেংরা শাক," বাথুয়া শাক, গিমা শাক, পুঁই শাক, "ইয়রেং শাক," "আমিলা-পাতা শাক," প্রভৃতি। এতভিন্ন নবোদ্গত আম পাতা, পেয়ারা পাতা, কাঁঠাল

---

(১) পরন্তু যে হাতে আহার করে, সেই হস্তেই মুখপ্রক্ষালন করিয়া থাকে। অনেকে মুখ-প্রক্ষালনজন্য খাইবার যায়গা হইতে আর উঠে না। মকের দুইটি বাঁখারী ফাঁক করিয়া 'কুজি' করিয়া লয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুখপ্রক্ষালনের নিমিত্ত "ওলদান" ব্যবহৃত আছে।

(২) প্রায় বিতস্তি পরিমাণ উচ্চ ত্রিপদ "বেড়" বিশেষ। ইহার উপর থালা স্থাপন করিয়া ভোজন করা হয় বলিয়া, "ভোজন বেড়" নামে কথিত হইয়া থাকে।

(৩) মেজাং—সচ্ছিদ্র ঝুড়ি বিশেষ; ইহাতে ভোজনবেড়ের কাজই চলে।

পাতা প্রভৃতিও শাকের শ্রেণীভুক্ত হয়। শাক পাক করিবার সময় লবণ ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হয় না। খাওয়ার সময় কাঁচা কি পোড়া লঙ্কা তাহাতে "গুজি-গুজি" আহার করে। কোন কোন শাক আগুণে চড়াইবারও প্রয়োজন হয় না। "ভুভুজি" কুটিয়া লবণ সহ বাঁশের মধ্যে ভরে। অনন্তর "গুতাইতে-গুতাইতে" যখন নরম হইয়া আসে, তখন বাটা লঙ্কা মিশাইয়া আনন্দের সহিত আহার করে। বিশেষতঃ লাউ পাতা, কুমুড় পাতা প্রভৃতি কেবল কিয়ৎক্ষণ রগড়াইয়া এবং "লেলম পাতা" মাত্র কিয়ৎক্ষণ বগলতলায় রাখিয়া ঈষদুষ্ণ হইলে লবণ ও মরিচ সহযোগে সচ্ছন্দে খাইয়া ফেলে। ইহারা লেবু পাতা, তেঁতুল পাতা, কামরাঙ্গা পাতা ইত্যাদিতে টকেরও সমধিক প্রিয়।

তরকারী—ইহাদের অপর্য্যাপ্ত। জুমে সশা, কুমুড়, "মারফা", বেগুন, চাকমা কচু প্রভৃতি যথেষ্ট মিলে। কাঁচাকলাদি এখানে এত অধিক ও সুলভ যে, কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে ৫।৬ গুণিত মূল্য দিয়াও এমন পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এ পাহাড়ের মান ও ওল কচু অতিশয় প্রসিদ্ধ; এরূপ আর কোথাও মিলে না। উহা অতি অল্প আয়াসেই এত সিদ্ধ হইয়া যায় যে, নূতন ভোক্তা কচু কি আলু খাইতেছে, উপলব্ধি করিতে পারে না। এখানে নানারকমের আলু প্রাপ্ত হওয়া যায়। শূকর ও সজারু যে সকল মূল আহার করে, ইহারা তৎসমুদয়ই আপনাদের খাদ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ইহাতে দরিদ্র পরিবারের বহুল অভাব নিবারিত হয়। বিশেষতঃ গত দুর্ভিক্ষে একমাত্র এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়াই অধিকাংশ পরিবার আত্মরক্ষা করিয়াছে। এ দুর্ভিক্ষে যদিও সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় রাজন্যবর্গ প্রায় লক্ষাবধি টাকার সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি কথিত মূলাদি সুলভ না হইলে খুব সম্ভব—এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী কালের করাল কবলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইত। এক বা দুই মুষ্টি চাউলের সহিত প্রভূত পরিমাণে "বাঁচরী" অর্থাৎ বংশাঙ্কুর এবং মূলাদি সিদ্ধ করিয়া ৫।৬ জনবিশিষ্ট পরিবার চলিয়াছে। শেষোক্ত উপকরণ বিশেষতঃ বাঁচরী শীঘ্র জীর্ণ হয় না, সুতরাং অনটনকালে ইহাতেই দগ্ধোদর পরিপূরণ করিতে পারিলে কিছু বেশী সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়। "বাঁচরী" দুর্ভিক্ষকালেরই প্রধান আহার্য্য সত্য, কিন্তু সচরাচর তাহাও বেতসাগ্র প্রভৃতি সুখাদ্য স্বরূপেই আহার চলে। কলা, বেগুন, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরিতরকারী সম্বন্ধে ইহাদের একটা প্রধান বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় যে, কাঁচা অপেক্ষা পাকাতেই তাহাদের আগ্রহ বেশী। সততই শুনিতে

পাই, এই সকল পাকা তরিতরকারীর বীজ ছাড়াইয়া পাক করিলে অতিশয় সুস্বাদু হয়। তরকারীর মধ্যে ডালনা, চচ্চরীরই প্রচলন অধিক; তদ্ভিন্ন লাউ, "মার্‌ফা" প্রভৃতি কোন কোন তরকারীর "কোর্ব্বোয়া" অর্থাৎ ছেঁচ্‌কীও খাইতে দেখা যায়।

ফল—ও নানাবিধ মিলে। বিশেষতঃ আরণ্যফলের অভাব নাই। যে যে ফল বানরে আহার করে, তৎসমুদয়ই ইহারা খাইয়া থাকে। ইহা অতি সুন্দর নির্ব্বাচন বটে। আদিম মানবসমাজে, বর্ত্তমান ভক্ষ্যসমুদয়ের নির্ব্বাচনে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইহাদিগের চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমরা তাঁহাদের আবিষ্কৃত পথে পদক্ষেপ করিতেছি মাত্র। অতিশয় বুদ্ধিমানেরা যে সতত "নগণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ" মন্ত্রের আড়ালে থাকিতে চেষ্টা করেন, সকলেই যদি তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে সংসারের উপায় কি হইত জানি না! ফলের সাধারণ নাম "গুলা"। কুল, কাউ প্রভৃতি "খট্টাগুলা" (অম্লফল) ইহারা সাতিশয় ভালবাসে এবং আম, চাল্‌তা, তেঁতুল প্রভৃতির "কাজী" অর্থাৎ অম্বল প্রায়শই খায়।

মৎস্য—সদ্য অপেক্ষা পঁচাতেই আগ্রহ বেশী; এমন কি কোন কোন মাছ ইচ্ছা করিয়াই পঁচাইয়া খায়। ভক্ষণীয় মৎস্যের বিস্তারিত তালিকা আর কি দিব? কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "ছুছুং" ছাড়া আর কোনও মাছ খাইতে ইহাদের বাধা নাই।

শুক্‌টী—তাজা মাছ হইতেও অধিকতর উপাদেয় বলিয়া গণ্য; বিশেষতঃ অগ্নি-উত্তাপে শুষ্ক হইলে—আদর আরও বাড়ে। বাজারে দেখিয়াছি, নিম্নশ্রেণীর চাক্‌মাগণ, চিংড়ি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের শুক্‌টী চিবাইয়া সুস্বাদু কিনা পরীক্ষা করে। ইহাদের সমাজে শুক্‌টী বলিতে কেবল শুষ্ক মৎস্যকে বুঝায় না, মাংসের শুক্‌টীও আছে। পাঁঠা ব্যতীত অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ জন্তুর মাংস দুইচারিবেলা খাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, শুকাইয়া রাখে। পরে তাহা আবশ্যকক্রমে পাক করিয়া আহার করে। শুক্‌টি "মিশাল" নামেই পরিচিত, তরকারী মাত্রেই ইহা মিশাইয়া দেওয়া হয়।

মাংস—নানা প্রাণী হইতেই আহৃত হয়। পাখীর মধ্যে শকুনী, ভিংরাজ প্রভৃতি কয়েকশ্রেণী ভিন্ন অপর গুলি খাইতে আপত্তি নাই। সাপের মধ্যে—"অজর সাপ", "দুতানালা সাপ", "দোমুখা সাপ", "বামন ন্যাদা সাপ", "ফুলাচাক্ সাপ" (ইহা খাইতে গন্ধ করে), "কালন্দর সাপ" (ইহার শরীর

হইতে মোরগের গন্ধ উঠে) মাত্র বাদ। সাপ মারিয়া প্রথমে মাথা ও অন্ত্রাদি ফেলিয়া দেয়, অনন্তর আগুণে সেঁকিয়া চামড়া ছাড়াইয়া ফেলে; অপরাপর প্রক্রিয়া সাধারণ। সর্প সমাজের নিকৃষ্ট সম্প্রদায়েরই খাদ্য বটে, কিন্তু গোসাপ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি শুনা যায় না। অধিকন্তু যাবতীয় মাংসের মধ্যে "গুই"য়ের মাংসই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু; ভেকের মাংস দ্বিতীয়। বেঙ নানা জাতীয় আছে। তন্মধ্যে "গাছ বেঙ", "শাক বেঙ", "ভাট বেঙ", "ভোবা বেঙ", "কর্কড়ি বেঙ", "কুদুবিচি বেঙ", "ঘর বেঙ", "কোণা বেঙ", "চুঙা বেঙ", "ঘিলা বেঙ", "খচ্ছোয়া বেঙ" ইত্যাদিই সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। শেষোক্ত দুই জাতীয় বেঙকে আঘাত করিলে ফুলিয়া উঠে। সাধারণ চাকমাগণ বর্ষাগমে বৃষ্টির পর রাত্রে মশাল জ্বালাইয়া যষ্টিহস্তে ভেকশিকারে বাহির হয়। পূর্ব্বোক্ত বেঙের মধ্যে কোন কোনটী আবার খাইতে নিষেধ আছে। কারণ যথা,—"ঘিলা বেঙ" খাইলে মাথা ঘুরায়; "খচ্ছোয়া" বেঙের গলমধ্যে একখানি কাল পর্দ্দা থাকে, তাহা খাইলে গলা ফুলিয়া যায়, এমন কি প্রাণবিয়োগেরও সম্ভাবনা। "কর্কড়ি" ও "ভোবা বেঙ" তজ্জাতীয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট। শুনিতে পাই, বেঙের অন্যবিধ পাক হইতে ভাজাই অধিকতর সুখাদ্য। পশুর মধ্যে শূকর, মহিষ, হরিণ, ছাগল, বাঘ, বিড়াল প্রভৃতি অনেকেই খাদ্যশ্রেণীতে পরিগণিত; কেবলকুকুর, হাতী, গরু ইত্যাদি কয়েক জাতীয় পশু মাত্র ভক্ষ্যতালিকা হইতে মুক্তি পায়। বিবাহে মহিষকাটা অবশ্য কর্ত্তব্য! শূকর মারিয়া চামড়া ফেলিয়া দিলে একবারে সাদা হইয়া যায়, পাকপ্রক্রিয়া অপরাপর মাংসের ন্যায়। বরাহ-মাংস অতিশয় তৈলাক্ত, কিন্তু মহিষমাংস বড়ই নীরস; মাংসের পরিমাণ সামান্য হইলে সঙ্গে 'থোড়' দিয়া পাক করিয়া থাকে।

ডিম্ব।—হংস, কুক্কুট, কচ্ছপ ও গোসাপের ডিম্বই ক্রমোৎকৃষ্ট। কাক, ময়না খঞ্জন, দয়েল, চিল, পেচক শকুনী প্রভৃতি ব্যতিরেকে আর সমুদায় পক্ষীর ডিম্বই ইহারা খায়।

শামুক ও কীটপতঙ্গ—নিম্ন সম্প্রদায়ের সচরাচর আহার্য্য। প্রায় সকল জাতীয় শামুকই তাহারা খাইয়া থাকে। ইহাদের ভাষায় কীট-পতঙ্গ উভয়েরই সাধারণ আখ্যা—"পোগ" অর্থাৎ পোকা। "পোগ" নাকি ভাজিয়া খাইতে অতিশয় সুস্বাদু; বিশেষতঃ "চেরাই পোগ্" ভাজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই পতঙ্গবিশেষ সংগ্রহের নিমিত্ত ইহারা বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময় গৃহসম্মুখে একখানি সাদা কাপড়

পাতে, এবং তাহার কিয়দ্দূর উপরে একটি মশাল রাখে। অনন্তর দুইখণ্ড বাঁশের বাখারী লইয়া বাজাইতে বাজাইতে ডাকিতে থাকে,—

"চে-রে—চে-রে—চেরে.....
চেরাই পোগা চেরাইয়া,
অংচেরে অংইয়া ;
ধোপ কাপড়ৎ পড়ি-যা
হাগনি-চালৎ মরি-যা ;
তোরে পেলে ন খাইয়া ;
তোরে মজা'লৈ ভাত মজা,
কুদু গেলারে বাঁদরী গোছা ?" ইত্যাদি—

তাহাতে রাশি রাশি মদলুব্ধ পতঙ্গ অনল-আলিঙ্গন প্রয়াসে আত্মসমর্পণ করে, ও বস্ত্রখণ্ডে পতিত হয়। কিন্তু "ওয়া-কালে" "চেরাইপোগ" ধরা নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত "ধুল্যাপোগ" বালি হইতে ফুৎকার দ্বারা এবং ঘুংরাপোগ মাটি খুঁড়িয়া বাহির করে।

লবণ—সাধারণতঃ আমাদের হইতে কিঞ্চিৎ বেশী খায়। পাতানুন খাওয়া ইহাদিগের জাতীয় পদ্ধতি। বৈদেশিক লবণের পশার বৃদ্ধির পূর্ব্বে ইহারা এক রকম পার্ব্বত্য বাঁশের ভস্মে জলের ধারা দিয়া লবণ বাহির করিত। তা' ছাড়া পাহাড়ের স্থলবিশেষে এমন প্রস্তরখণ্ড সকল আছে, তৎসমুদায় হইতে লবণাক্ত জল নিঃসৃত হয়। অদ্যাপি তাহাতে অনেকে উপকৃত হইতেছে।

লঙ্কা মরিচ—অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমন কি, পোড়া শুক্‌টির মাথা, রসুন, ও লবণ সহযোগে যে "মরিচবাটা" প্রস্তুত হয়, তাহাতে লঙ্কার ভাগ এত থাকে যে,—দেখিতেই ভয় হয় ; অথচ ইহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত ঊকুঞ্চনমাত্রও না করিয়া তাহা খাইয়া ফেলে! মরিচাদি পেষিবার নিমিত্ত শিলনোড়ার প্রচলন বিরল। 'চারী'র গঠনে মাটির "কুর্য্যা" প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লয়। সেই কুর্য্যার মধ্যে লঙ্কা দিয়া গুতাইতে গুতাইতে নরম করিয়া থাকে। অনেকে অতদূর অসুবিধাও স্বীকার করিতে চাহে না ; আগুনে একটুকু সেঁকিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া তরকারীতে দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন—

তৈল ও গোলমরিচের—ব্যবহারও সাধারণ সম্প্রদায়ে ক্বচিৎ ঘটে। গরমমসলা নাই বলিলেই হয় ; তৎপরিবর্ত্তে তণ্ডুলচূর্ণ শুষ্ক করিয়া রাখে;

তাহার কিছু কিছু তরকারীতে ছড়াইয়া দিলে নাকি মসলার গন্ধ পাওয়া যায়। ঘৃত ইহাদিগের পক্ষে সুলভ, কিন্তু অনেকেই খাইতে চাহে না।

পিষ্টক—বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য। আত্মীয় বাড়ী যাইতে, প্রধানতঃ বিবাহের প্রস্তাবনাসূচক 'তত্ত্বে' পিঠা নেওয়া একান্ত আবশ্যক। পিষ্টক নানাবিধই প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কয়জাতীয়ের বিবরণ যথা; ১। "খগাপিদা;—" জলাসিক্ত "বিনি" চাউল পাতায় মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে; অর্থাৎ একটি জলপূর্ণ "হাঁড়ি"র মুখে অপর একটি সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্রতর "হাঁড়ি" বেশ করিয়া আঁটিয়া লাগায়, পরে তাহা জালের উপর স্থাপন করিয়া উপরের পাত্রে পত্রমণ্ডিত তণ্ডুলগুলি রাখে এবং তাহার মুখেও ঢাকনী দেয়। ইহাতে নীচের পাত্রোত্থিত বাষ্পে উপরিস্থিত পিঠা সিদ্ধ হইয়া যায়। ২। "বিনি পিদা;"—"বিনি" চাউলের আটা পাতায় মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে। এই দুই পিঠাতেই নারিকেল 'কোড়া' দিবার রীতি আছে। ৩। "কলা পিদা;"—যে কোন চাউলের মিহি আটায় পাকা কলা মাখিয়া লয়। অনন্তর তাহা পাতায় আয়তাকারে মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে। চট্টগ্রামে ইহা "কলাবড়া পিঠা" নামে প্রসিদ্ধ। ৪। "বেঙ্‌পিদা";—যে কোন চাউলের মিহি আটাতে যৎসামান্য জল মাখিয়া পাতায় চতুর্ভুজাকারে মোড়ে; অনন্তর বাষ্পে সিদ্ধ করে। এই পিষ্টক সচরাচর রোগীকে পথ্য স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ৫। "সান্তা পিদা";—খুব মিহি চাউলের আটায় ডেলা করা হয়। তাহা বাষ্পে সিদ্ধ করার পর চূর্ণ করিয়া তদুপরি নারিকেল কোড়া ছড়াইয়া দেয়। অতঃপর কিঞ্চিৎ জল মাখিয়া পুনর্ব্বার গোলা করে এবং তন্মধ্যে গুড় কি চিনি দিয়া হাতে কি থালায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডিম্বাকৃতি করিয়া লয়। অতঃপর তাহা বাষ্পে সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ৬। "বরাপিদা";—"বিনি' বা অপরসাধারণ চাউলের মিহি আটায় কিঞ্চিৎ জল মাখিয়া তৈলে ভাজিয়া লয়। ৭। "পাক্কোন (মুসলমানী আখ্যা—পাক্কোয়ান) পিদা";—চাউলের মিহি আটা (তন্মধ্যে "বিনি" চাউলের আটাও সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া দিলে ভাল ফুলে) ও গুড়ে কিঞ্চিৎ জলদ্বারা একত্রে মাখিয়া, তাহা তৈলে ভাজিয়া থাকে। এই শেষোক্ত দুই পিষ্টকের আকৃতি গোলাকার। পিঠা সাধারণতঃ শূকরের চর্ব্বিতেই ভাজা হয়; নিতান্ত অভাব না হইলে সরিষা বা অপর কোন তৈলে ভাজে না। কেন না, শূকরের চর্ব্বিতে নাকি অধিকতর মুখরোচক হইয়া থাকে। ৮। "দুঁ-ই পিদা";—চাউলের আটা নারিকেলের মালায় করিয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে।

৯। "ইন্দুর লাদি পিথা";—চাউলের আটায় জল মাখিয়া ইঁদুরের লাদের আকারে আকারে পাকায়, পরে চিনি যোগে সিদ্ধ করে। বাষ্পে সিদ্ধ পিষ্টক পর্য্যসিত হইলে, ইহারা তাহা আগুনে সেঁকিয়া খাইয়া থাকে।

ভাজাপোড়া—ইহাদিগের মধ্যে খুবই কম প্রচলিত। চিড়ে বা মুড়ির ব্যবহার সকলে অদ্যাপি শিখে নাই। কেবল মাত্র "ধান খোলা" করিতে অর্থাৎ খই ভাজিতে জানে। ইহারা ভুট্টা—সিদ্ধ, পোড়া ও ভাজা ত্রিবিধ রূপেই খাইয়া থাকে।

জল—ও ভাত পাহাড়ীগণ এত পরিষ্কার খায় যে, তাহারা তজ্জন্য আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য। খাওয়ার এবং "ফেলা ঝোলা" করিবার "পানি" (জল) বিভিন্ন থাকে। যে সময়ে খালের জল ঘোলা হয়, তখন ইহারা ঝরণার জল পান করে। পানীয় জল সংগ্রহের নিমিত্ত চাক্‌মা রমণীরা এই দুর্গম পার্ব্বত্য পথে দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। খাবার জলের ঝরণা যথাসাধ্য পরিষ্কৃত রাখে; কাপড়কাচা প্রভৃতি হইতে দেয় না। আমি যখন এখানে নূতন আসি, সেই সময়ে রাঙামাটি স্কুল বোর্ডিংএর একটি ঝরণায় স্নান করিতাম। সেই ঝরণার জলই বোর্ডিং এর ছাত্রগণ পান করিত। কিন্তু আমি পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ স্নানের পূর্ব্বে 'তয়েল' (towel) খানি ঝরণায় ডুবাইয়া লইতাম। ইহাতে যে কোন আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। এরূপে কয়েকদিন গেলেও ছাত্রেরা লজ্জায় আমাকে কিছু বলে নাই। অনন্তর একদা জনৈক বুদ্ধিমান ছাত্র অতি বিনীত কৌশলে আমাকে তাহাদের আপত্তির কথা জানাইল। বলিতে কি, আমি তাহাতে যেমন লজ্জিত হইয়াছিলাম, পক্ষান্তরে পানীয় জলের প্রতি তাহাদিগের এরূপ সাবধানতা দেখিয়া ততোধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম।

কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন (১),—"এই পাহাড়ে এক রকমের লতা আছে, তাহা কাটিলে স্বচ্ছ ও সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। উচ্চ পর্ব্বত লঙ্ঘনার্থীদিগের এই লতার রসই একমাত্র পিপাসা নিবারণের উপায়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লতাখানিকে এক ঘায়ে কাটিলে কিছুই পাওয়া যায় না, আবার ৩।৪ ঘায়ে কাটিলেও শুকাইয়া যায়। কিন্তু যদি তাড়াতাড়ি (উপরে ও নীচে দুই স্থানে) দুই ঘায়ে কাটা যায়, তাহা হইলে এক বড় গ্লাসের প্রায় অর্দ্ধেক পরিষ্কার শীতল

(১) The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, page 9.

জল বাহির হয়। পাহাড়ীরা বলে, লতাখানিকে যখন কাটা যায়, তাহার জল উর্দ্ধমুখে ধাইতে চাহে।"

ইহারা ভাত খাইবার সময় জল পান খুব কমই করে। কিন্তু পরে যখনি তৃষ্ণা পায়, তখনই তাহা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত জুমে যাইবার কালে তথায় খাইবার জলের অভাব বুঝিলে বাড়ী হইতে চুঙা করিয়া জল লয়। "কোত্তি" (১) করিয়াই ইহাদের জল পানের নিয়ম। তাও মুখ না লাগাইয়া খায়; ইহাতে অবশিষ্ট জল দূষিত হইতে পারে না।

দধি-দুগ্ধ—ও ইহাদের যথেষ্ট সত্য, কিন্তু অতি অল্প লোকেই সদ্ব্যবহার করে। বিশেষতঃ পেটের অসুখ হইবার ভয়ে মহিষের দুধ বা দই প্রায়ই খায় না। যাহাদের খাইবার অভ্যাস আছে, তাহারা মাত্র গরুর দইদুধই খায়। তন্মধ্যেও আবার অনেকে আহারের পর মুখক্ষালনের শেষে এই দুধ বা দধি খাইয়া থাকে। অত্রত্য পাহাড়ীরা বাঁশের চুঙাতেই দই জমায়; তাহাতে তৈলাক্ত অংশ নষ্ট হয়। সুতরাং চুঙায় মহিষের দধিতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা কম। ইহারা দুধ হইতেও দইকে অধিক পছন্দ করে।

সুরা—ইহাদিগের মধ্যে অতিশয় সাধারণ (২)। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ভাটি রহিয়াছে। ইহারা ইচ্ছানুরূপ সুরা প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। স্ত্রী এবং বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে মাত্র মদ্যের প্রচলন অধুনা কিঞ্চিৎ বিরল, নতুবা ইহারা অভিভাবকের সম্মুখে সুরাপানেও লজ্জা বোধ করে না। বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে পান তামাকের সহিত মদের বোতলটিও যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এতদ্ভিন্ন নিমন্ত্রণে ইহা অবাধে চলে। এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর কিছুক্ষণ পরে পরে মদ্য পরিবেশন করিবার ভার থাকে। বিবাহ, উৎসব এবং নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্যে ইহার ব্যবহার এত অধিক যে, শুনিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয় (৩)। কুমার বাহাদুরের বিবাহে দেখিয়াছি, এক সুবৃহৎ ঘর কেবল মদ্যকলসীতে পরি-

(১) জলপাত্রবিশেষ, গঠনপ্রণালী গাড়ুর ন্যায়।

(২) পান পাত্র—সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে অবশ্য কাচের বা ধাতুজ গ্লাস ব্যবহৃত হয়। দরিদ্রগণ "নয়ানসুক" বাঁশের পাত্রেই প্রয়োজন সাধন করে। এই বাঁশ আয়োতনে ৩।৮ ঘনফুট এবং পরিধিও প্রায় ৬ ছয় ইঞ্চি পরিমিত হইবে।

(৩) "রাজস্থান" পাঠে যেরূপ জানিতে পারি, সুরাপ্রীতিতে রাজপুতগণও ইহাদের হইতে বড় কম নহে। অতিথিসৎকারের "মান্নার পেয়ালা" রাজপুত গৃহীর আবশ্যকীয় গৃহসরঞ্জাম; দেবার্চ্চনা ও রণোদ্যমেও পানকার্য্যে তাঁহাদের অত্যধিক আগ্রহ।

পূর্ণ ছিল। এই সমস্ত মদ প্রজাসাধারণের "ভেট"-প্রদত্ত। এইরূপে ইহাদিগের জাতীয় উপঢৌকন মাত্রেই অল্পবিস্তর মদ্য থাকে। সামাজিক কোন কোন কার্য্যে মদ এরূপ প্রয়োজনীয় যে, যাহাদের পানের অভ্যাস নাই, তাহাদিগকেও অন্ততঃ মস্তকে স্পর্শ করাইতে হয়। গ্রামে ওলাওঠা প্রভৃতি মহামারী উপস্থিত হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মদে বিভোর থাকে। ইহাদের ধারণা, এই বিষের মধ্যে অপর কোনও বিষ স্থান পাইতে পারে না। এইরূপে ইহাদিগের মদ্যপানের কারণ অপর্য্যাপ্ত নহে। পরন্তু মদ্য পানে ইহারা যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। এতৎসম্বন্ধে আমি নিজে আর কিছু না বলিয়া, নিম্নে ১৩১১ সালের ১৮ই শ্রাবণ "জ্যোতি"তে প্রকাশিত একখানি প্রেরিতপত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি, ইহা হইতেই পাঠক-পাঠিকাগণ গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন :—

"ইহারা দেশীয় কৃষক অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিতে পারে ; তাহাদের অপেক্ষা বেশী আয়ও করে। ইহারা এত পরিশ্রম ও আয় করিয়াও সুখী হইতে পারিতেছে না। বৎসরের ধান্য ঘরে জমা থাকে না। দিন দিন ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করে। কারণ, ইহারা সকলেই খুব বেশী পরিমাণে মদ্য পান করে। প্রতি ঘরে ঘরে মদ্য প্রস্তুত হয়। মদ্যপান করার কোন নিয়ম নাই ; যত ইচ্ছা তত পান করে। ইহাদের মদের তৃষ্ণা এত বেশী যে, দেখা গিয়াছে ভাত খাওয়ার চিন্তা অপেক্ষা মদ তৈয়ার করার বেশী আগ্রহ। যতদিন ইহাদের ঘরে ধান্য থাকে, ততদিন মদের ভাণ্ড খালি থাকে না। দুই তিন দিনের পরিশ্রমে যাহা আয় হয়, ৪।৫ জন একত্রে তাহা মজিলিসে ব্যয় করিয়া দেয়। ছোট বড় মজিলিস সর্ব্বদা গঠিত হয়। সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়া যাহা আয় করে, তাহার অর্দ্ধেক কেবল সুরারাক্ষসীর সেবায় অপব্যয় করে এমন নহে, মদ্যপানে অজ্ঞান হইয়া অনেকে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বাদবিসম্বাদ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই সম্পর্কীয় বহু সংখ্যক সালিশ মোকদ্দমা হইয়া থাকে। পুরুষেরা সময়ে সময়ে মদের প্রসাদে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির উপরও যথেচ্ছ উপদ্রব করিয়া গৃহকে অশান্তিময় করিয়া তোলে। আবার ইহাদের বিবাহ, পর্ব্ব, উৎসব ও নিমন্ত্রণাদিতে অনেক বেশী পরিমাণ মদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তখন যত ইচ্ছা তত মদ্যপান করিতে পারে। সেই সময় অতিরিক্ত মদ পান করিয়া কত জনের অবস্থা কতরূপ তাহার পরিসীমা থাকে না। এই সকল অপব্যয়ে জুমিয়াদের বৎসরে ধান্য জমা থাকে না ; বর্ষাকালে কেহ কেহ অনশনও থাকে।"

এই সমুদয় সুরা সচরাচর বিবিধ উপায়ে প্রস্তুত হয়। প্রথম সাধারণ মদ—প্রস্তুত করিতে আগে পর্য্যুসিত ভাতে "মুলী" (১) মাখিয়া পাতায় আচ্ছাদিত ঝাঁকাতে রাখিয়া দেয় এবং উপরেও পাতা ঢাকা দিয়া থাকে। ২।৩ দিন পরে তাহাতে রসসঞ্চিত হইতে দেখা গেলে নিয়মিত জলের সহিত কলসীতে পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করে। সেইরূপে আরও ২।৩ দিন রাখিয়া পরে তাহা চুয়াইয়া লয়। এই সাধারণ মদ্য দ্বিতীয়বার পরিশ্রুত করিয়া লইলে শক্তি অতিশয় তীব্র হয়; তাহার নাম "দোচুয়ানী-মদ"। ইহা অপেক্ষাকৃত দুর্লভ বলিয়া সাধারণ্যে বিরল ব্যবহৃত। দ্বিতীয় "জোগরা";—তাহার প্রস্তুত প্রণালীতে পরিশ্রমের ভাগ কম। বিনি চাউলের ভাতে "মুলী" মাখিয়া কলসীপূর্ণ করত মুখ বন্ধ করিয়া রাখে ইহাতেই তাহাতে রস সঞ্চিত হয়। এই রসের নামই "জোগরা"। "জোগরা" খাইতে খুব মিষ্ট, এবং মাদকতাও মধুর! ভদ্রপরিবারে ও স্ত্রীসম্প্রদায়ে ইহারই প্রচলন অধিক। পরন্তু মুখতৃপ্তি এবং মৃদুমাদকতার আমোদ কেবল ইহাতেই সম্ভবে! পূর্ব্বোক্তরূপে সঞ্চিত রস নিঃশেষ হইলে, তাহাতে জল দিয়া আবার কয়েক দিবস ধরিয়া রাখে। অনন্তর সেই জলেও যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টি ও নেশা লাভ হয়। এইরূপে তিন চারিবার পর্য্যন্ত জল দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ক্রমশই শক্তি কমিয়া আইসে। মাদকতা নিতান্তই কমিয়া আসিলে, কেহ কেহ এই মিশ্রিত জল চুয়াইয়া লয়; তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

তামাক।—ইহাদিগের কথায় ধুঁয়া। মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষ সম্প্রদায়ে আর প্রায় সকলেই সেবনে অভ্যস্ত। এমন কি, অনেকে গুরুজনের সাক্ষাতে খাইতেও লজ্জাবোধ করে না। তবে গাঁজা, আফিঙ্‌ এযাবৎ ইহাদিগের মধ্যে তেমন প্রবেশ লাভ করে নাই।

পান—ও ইহাদের সাতিশয় প্রিয়বস্তু। অবিরত পান চিবাইতে পারিলে ইহারা নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে। কোন স্থানে যাইতে হইলেও "পানের থল্যা" কোমরে লইতে ভুলে না। এই "থল্যা" অর্থাৎ থলিতে পান, সুপারি, চুণের কোটা ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত হয়। বৃদ্ধগণ পানের সহিত তামাকপাতাও

(১) "মুলী"।—চাউলের আটার সহিত "বড়পেডাগুলা", "পেমা", "কাটোরাডগর" গাছের ছাল, "দেরকবি" লতা, ইক্ষুপাতা প্রভৃতি সমুদয় কিংবা যে কোন পদের রস মাখিয়া ডেলা ডেলা করতঃ খড়ে পোড়াইয়া লয়; ইহা দেখিতে সাদাটে।

খাইয়া থাকে। খয়েরের প্রচলন পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি প্রায় সকলেই তাহা ধরিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর মসলা সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভিন্ন দেখা যায় না। প্রত্যুত পান, সুপারি, চুণ—যাহা নিত্য ব্যবহার্য্য, ইহাদিগের অনায়াস লভ্য। প্রত্যেক বাড়ীতেই "গাছ পানের" "ক্ষেত" রহিয়াছে; বন্য "রামসুপারি" ইচ্ছা করিলে সহজে পাইতে পারে; এবং শামুক পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করিয়া লয়। শুনিয়াছি, এই পানের আদান প্রদান দ্বারাই যুবক-যুবতীর প্রণয়-প্রস্তাব চলিয়া থাকে; সঙ্কেত যথা,—যদি মসলাদি সহযুক্ত পানের মধ্যে করিয়া কোন ও ফুল বা ফুলের পাপ্‌ড়ি কাহাকেও প্রদান করা হয়, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, "আমি তোমাকে ভালবাসি"। প্রত্যর্পণে যদি অধিক মসলা এবং বিশেষ ভাবে সজ্জিত কোণায় পান লাভ হয়, তাহা হইলে "আস" —ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে; অথবা প্রতিদত্ত পানে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাসংযোগ থাকিলে "আমি এখন পারিব না," কি ভিতরে অঙ্গার খণ্ড দেওয়া হইলে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

পরিশেষে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, উপরিউক্ত খাদ্য ও পানীয় তালিকা চাক্‌মা-সমাজের সাধারণ শ্রেণী অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ যাহাদের দ্বারা পুষ্ট, তাহা-দিগকে দেখিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে। ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খাদ্য-নির্ব্বাচন প্রায় উন্নত সভ্যতানুমোদিত। ইহাদের কেহ কেহ মৎস্য-মাংস কি মদ্য সম্পূর্ণই পরিত্যাগ করিয়া আছেন। পক্ষান্তরে ক্রমে মধ্যশ্রেণী সাধারণ শ্রেণী হইতে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া ভদ্র সম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছেন,—ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষা।

চাকমাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা শাস্ত্র নাই। তাহারা অনেকে রোগ অবধৌতিক ব্যবস্থা মাত্র অবলম্বনেই সারিবার চেষ্টা করে। বিশেষতঃ

চিকিৎসা।

সুসভ্য মহাশয়দের ন্যায় ইহারা অহর্নিশ শরীরের সেবায় তৎপর নহে; তদ্দিকে অতি সামন্যই দৃষ্টি রাখে। অনেকের সাংসারিক অবস্থাতেও তাহা পোষাইয়া উঠে না; কাজে কাজেই ইচ্ছা না থাকিলেও অনেকে অনেক সময়ে নীরব থাকিতে বাধ্য হয়। তবে ইহা সত্য যে, ইহারা প্রথমে প্রায়শই প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া রহে।

সমাজে হাতুড়ে বৈদ্যের সংখ্যাই অধিক। তাহারা মুষ্টিযোগ এবং "ঝারা-ফুঁ" মাত্র সম্বল লইয়া ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে সুরতচন্দ্র ও মীননাথ বৈদ্যের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। এই সকল বৈদ্যের অনেকে

চিকিৎসক।

অধুনা "কবিরাজী শিক্ষা" বা তথাবিধ পুস্তক আশ্রয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন্থনেও মনোযোগ দিয়াছে, বটে কিন্তু তন্মধ্যে কেহই এযাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তথাপি উন্নত সম্প্রদায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার প্রতি ভক্তিমত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে কয়জন বাঙ্গালী কবিরাজও বাস করেন, কঠিন রোগে চট্টগ্রাম হইতে সুবিজ্ঞ কবিরাজ আনান হয়। সম্প্রতি ইংরাজরাজের কৃপায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতিও ইহাদিগের অনুরাগ পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থাই ইহার কারণ (১)। অন্ততঃ কিছুকাল হইতে খৃষ্টিয়ান মিস-

(১) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাঙামাটি ও বান্দরবনে মাত্র দুই খানি হাসপাতাল ছিল; সেই সনের উভয় হাসপাতালের রোগীসংখ্যা একুনে ১১৪৭৭। অনন্তর লামা, বড়কল, রামগড়, মাহালছড়ী এবং মাণিকছরীতেও দাতব্য চিকিৎসা বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই সকল সরকারী চিকিৎসালয়ে গত বৎসর (১৯০৮ খৃঃ অঃ) মোট ৩০৫১৯ জন রোগী সাহায্য পাইয়াছে, তন্মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা ৭২৮। এই তালিকার এক রাঙামাটি হস্পিটালেরই রোগী সংখ্যা ১২৪৬০ জন; তাহাতে

নারীগণও এই দরিদ্র পাহাড়ীদিগের চিকিৎসাবিধানের প্রতি সাতিশয় মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন (১)। তদ্বারাও এলোপ্যাথির প্রতি ইহাদের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। রাজ পরিবারের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত স্থানীয় গভঃ হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। জনৈক কবিরাজ রাজসরকার হইতে ঐরূপ বৃত্তি লাভ করেন। কিছুদিন গত হইল, রাজা বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীমান মদনমোহন দেওয়ান কলিকাতা কাম্বেল বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। যদিও তিনি সরকারী কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদ্বারা স্বজাতি ও স্বদেশের বহুল উপকার ঘটিবে, আশা করা যায়।

রোগ প্রতিকারেরর ব্যবস্থা প্রত্যেক জাতিতেই আছে সত্য, তবে সাধারণতঃ ইহাতে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ শুশ্রূষা অপেক্ষা চিকিৎসাকেই আরোগ্য লাভের প্রকৃষ্টতর পন্থা মনে করেন। অপর দলের অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুতঃ ইহা ধ্রুবসত্য যে, শুশ্রূষার প্রতি উদাসীন থাকিলে শত চিকিৎসাতেও ফললাভ অসম্ভব। (২) বিশেষ কি, কেবল শুশ্রূষার উপর নির্ভর করিয়াই অনেককে রোগকবল হইতে রক্ষা পাইতে দেখা গিয়াছে। চাক‍্মাদিগের প্রায় সকলেই শেষোক্ত মতাবলম্বী; ইহারা শুশ্রূষার নিমিত্ত যথাসাধ্য সাবধান থাকে, কাহারও অসুখ হইলে প্রতিবেশী অপরেরা আসিয়া সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় না।

শুশ্রূষা।

indoor ৯৯, outdoor ১২৩৬১ এবং অস্ত্র চিকিৎসা ১৬৩। এই জিলার চিকিৎসা কার্য্যে ১৯০৭-০৮ সনে গভর্ণমেণ্টের ১৪৬৮৪৲ ৫ পাই গিয়াছে; পর বৎসরের ব্যয় পরিমাণ ১৬০৯৬৷৷১১ পাই। প্রসঙ্গত বলিতে হয়, এখানকার ভেক্সিনিসানের নিমিত্তও গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক প্রায় ৩০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

(১) প্রথমে ১৯০৫ অব্দে রাঙামাটিতেই তাঁহাদের এই চিকিৎসা বিভাগ খোলা হয়। সেই বৎসর রোগীসংখ্যা প্রায় ২০০০ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরেই তাহা চন্দ্রঘোনায় স্থানান্তরিত করেন; তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে ঘুরিয়াও তাঁহারা ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। এইরূপে ১৯০৭ সনে তাঁহারা চন্দ্রঘোনায় ১১৯১৪ এবং মফস্বলে ৬৮৫ জন রোগীকে চিকিৎসা-সাহায্য প্রদান করেন; তন্মধ্যে ১২৪টী অস্ত্রচিকিৎসা ছিল।

(২) কথিত আছে, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কালীচরণ লাহিড়ী মহোদয় জনৈক রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া গৃহের হানি-অভাব দর্শনে 'প্রেস্কৃপসনে' এক গাড়ী খড় ধরিয়া দিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে ঔষধ প্রয়োগই চিকিৎসার একমাত্র প্রক্রিয়া নহে, প্রকার বিশেষ মাত্র। সাধারণ অসুখাদিতে—১। মন্ত্রপূত কবচ ধারণ বা "ফু" ঝাড়িলেই যথেষ্ট, তদপেক্ষা কঠিন রোগে—২। মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন রোগ নিতান্ত সাংঘাতিক হইলেও, মাত্র এই দ্বিবিধ চিকিৎসায় আশ্চর্য্যজনক উপকার পাওয়া যায়। কবিরাজী, ডাক্তারী বা হাকিমী প্রভৃতি চিকিৎসা এই শেষোক্ত শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। আর যখন বুঝা যায় রোগ সহজে দূর হইবার নহে, তখন—৩। দেবতা বিশেষের পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতেই নাকি রোগের চরম শান্তি হইয়া যায়।

চিকিৎসা-শাখা।

কবচ ও মন্ত্রপ্রয়োগে চিকিৎসা।

শুনিতে পাই, কবচ ও মন্ত্রশক্তিতে নানা বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়া থাকে। ইহারা প্রাচীনকালে এতৎ প্রভাবে ভূতপ্রেত নাচাইতে পারিত; আরব্যোপন্যাসের দৈত্য-বশীকরণ ক্ষমতাও ইহাদের দুর্লভ ছিল না। অর্থাৎ কবচ বা মন্ত্রবলে সেকালে অসাধ্যসাধন হইত, কিন্তু নানা অত্যাচার অবিচারে এখন সে শক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। তথাপি অধুনা মন্ত্রশক্তিতে সাপ ধরা বা সাপের বিষ নষ্ট করা চলে। এমন কি, ইহাতে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগগুলিও নিবারিত হয়; এবং আমরণ জ্বর, বাত প্রভৃতির উপদ্রব শূন্য হওয়া যায়। মন্ত্রের এই দৈবীশক্তি শিক্ষিতসমাজও অস্বীকার করেন না।

মন্ত্রের সাধারণ আখ্যা—"ফু"। ইহা পাঠের পর ফুৎকার দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে, বিশেষতঃ অন্যলোকে কেবল "ফু" মাত্র শুনিতে পায় বলিয়াই বোধ হয় ইহার এই সংক্ষিপ্ততম অভিধা প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ এই মন্ত্রগুলি ইহাদের স্বকীয় সম্পত্তি কিনা, তাহাই সন্দেহের বিষয়। ভাষা ও ভাব দৃষ্টে এই সমুদয়ের কোন কোনটী যে অনতিপূর্ব্বেই (চট্টগ্রামের) হিন্দুসমাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। নমুনাস্বরূপ সাধারণ একটি মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি; যথা—

"ওঁম্ হুকার।
(রোগীর নাম)এর বাঁধম্ দশমীর দশ দুয়ার।
আঠার মোকাম স্থিরম্ নিরঞ্জন,
আজ্ঞা করিবে কালিকা-চন্দ্রিকার;
ছিতে বাঁধম্, পিত্তে বাঁধম্,

বাঁধস্ চৌচালা।
চোখেতে চোখ বাঁধস্, যম রাজার পোলা॥
আকাশের ইন্দ্র বাঁধস্, পাতালে উনকোটী নাগ।
(রোগীর নাম)এর পঞ্চ প্রাণী রক্ষাতাক্॥"

প্রত্যূষে খালিপেটে নদীর স্রোতোঽভিমুখী জলে একটী কলসী পূর্ণ করিয়া, সেই জল উক্ত মন্ত্রপূত করিয়া লয়; তদ্দ্বারা স্নান করিলেই যে কোন জ্বর বিদূরীত হইয়া থাকে। "ঘায়ৎ থণ্ডাস লাগিলে"ও অর্থাৎ যদি কোন ঘা কোনপ্রকারে দূষিত হইয়া পড়ে, ঐ মন্ত্রপূত জলে ধুইয়া লইলে, তাহা অচিরে শুকাইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এই মন্ত্র শরীরে পড়িয়া দিলে—"গা-বন" হয়, অর্থাৎ ভূত-প্রেত-সাপ-বাঘ প্রভৃতি হইতে দেহ নিরাপদ থাকে।

মুষ্টিযোগ।

মুষ্টিযোগ দ্রব্যগুণের সরল চিকিৎসা। উৎকৃষ্টতর সংস্করণে ইহাই ডাক্তারী, হাকিমী, কবিরাজী প্রভৃতি নানাবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। অপরাপর চিকিৎসায় যুক্তিতর্কের মীমাংসা আছে সত্য, কিন্তু মুষ্টিযোগের কৃতিত্বসংবাদ অত্যন্ত বিস্ময়োদ্দীপক। সুখের বিষয়, এখনও চারিদিক্ হইতে ইহার আবিক্রিয়া চলিতেছে। আশা করি, এইরূপে ক্রমে ভগবানের সৃষ্টিরাজ্য মানবসম্প্রদায়ের অধিগত হইয়া পড়িবে। এস্থলে চাক্‌মাসমাজে প্রচলিত কয়েকটী মুষ্টিযোগতত্ত্ব উদ্ধৃত করিলাম। বলা বাহুল্য, মদীয় সংগ্রহ অতি সামান্যমাত্র! পাহাড়ীদের বিশেষতঃ চাক্‌মাদিগের প্রত্যেকে কিছু না কিছু পরিমাণে ইহার খবর রাখে।

১। কাটা ঘায়—"রাঙা মোছা মা" গাছের (১) শিকড় অথবা 'বাঁশকাপুর' সহযোগে তেয়রী পাতা বাটিয়া দেয়।

২। পোড়া ঘায়—সাপের তৈল দিলে শীঘ্রই সারে।

৩। নালী ঘায়—গোরুনের পাতা ভস্ম করিয়া ঘায়ের মুখে দিলে নালী ভরিয়া আইসে।

৪। দদ্রুতে—"দত্তলং পাতা", কেরোসিন তৈল, লবণ ও ঝুল মিশাইয়া আতপতপ্তকরতঃ মালিশ করে।

৫। কেশ কোঁড়া—"বেইশাক" বা "হরিণকান শাক" বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপশমিত হয়।

(১) যে সকল লতা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, 'ডবল কোটেশনের' মধ্যে তাহাদের চাক্‌মা নাম রাখিতে বাধ্য হইলাম।

৬। বিষ-ফোঁড়ায়—"হরিণকান শাক", বিছুটি পাতা এবং "ডুলপান" বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপশমিত হয়।

৭। পাঁচড়া-ফোঁড়া—"ফুলশোঁয়ানি" গাছের বাকল, নিমের পাতা এবং ভাট-পাতা সিদ্ধজলে ধুইয়া ফেলিলে শীঘ্রই সারিয়া যায়।

৮। বাত ফোঁড়ায়—বিছুটি পাতা ও "ডুলপান" অথবা রাঙা মুছ্যানি পাতা এবং "কাঁবাখ্যা লুদি" বাটিয়া দিয়া থাকে।

৯। আঙ্গুল হাড়ায়—"হরিণকান শাকের" পাতা এবং ভেরেণ্ডা পাতা বাটিয়া প্রলেপ দেয়।

১০। গতিশীল বা অস্থির বাতে—"মোন্‌চত্তা" পাতা, বিছুটি পাতা, "ডাইনের হাত পা", গোমটি পাতা প্রভৃতি বাটিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করত বাতের ফুলায় লেপিয়া দিলে সারিয়া যায়।

১১। চোখে রক্ত আসিলে—"বের লতির" দুইপ্রান্ত উত্তমরূপে কাটিয়া লয়। পরে তাহার একপ্রান্ত রক্তবেষ্টিত চক্ষুর উপর ধরিয়া অপরপ্রান্তে ফুৎকার দিলে তন্মধ্যস্থিত রস চোখে পড়ে, ইহাতে চোখ পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রকারান্তরে একজাতীয় শ্বেতপ্রস্তর জলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘষিয়া সেই জলে চোখ ধুইয়া ফেলিলেও আরোগ্য লাভ হয়।

১২। শিরপীড়ায়—পাতি লেবুর শিকড় তাহার রসে পিসিয়া কপালে প্রলেপ দিলে সারিয়া যায়।

১৩। মাথাধরায়—বাটা সরিষা একখণ্ড নেক্‌ড়াযোগে মাথায় বাঁধিয়া রাখিলেই কমে।

১৪। কেশ উঠা—"ধোপচুয়া ফুল" গাছের শিকড় বাটা জল মাখিলে নিবারিত হয়।

১৫। একশিরা—"হাজগাছ" ও "কোনই গাছের" শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে সারে।

১৬। সান্নিপাতিকে—"বারেঙ্গা লুদি"র রস স্ফীত স্থানে লাগাইলে কমে। অথবা "তেলসর গাছ", "বাঁদরসাঁর গাছ" ও অশ্বত্থ গাছের বাকল সিদ্ধজলে মুখ ধুইলে এবং তৎসমুদয় বাটিয়া বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে সান্নিপাতিক দূর হয়।

১৭। হাত পা ভাঙিলে—"হাড়ভাঙা" লতার পাতা বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করত ভাঙ্গা স্থানে লাগাইলে শীঘ্র সারিয়া যায়।

১৮। কানপাকা—"আদা গুন্‌গুনি" (মণ্ডুরী) ও "জোতানির্ব্বিষ" পাতার রস অথবা পাটপাতার রস দিলে আরোগ্য হয়।

১৯। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে—ক্ষত স্থানে মদের "মূলী" বাটিয়া দিলে ভাল হয়।

২০। কফবৃদ্ধি রোগ—সমান ওজনের তিত পটলের দানা, আপাং ও সাপের পিত্ত পিষিয়া খাওয়াইয়া দিলে কমিয়া যায়।

২১। কাস রোগে—"চেয়ন্বিবা" পাতার রস কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া খাইলে নিরাময় হওয়া যায়।

২২। বুক বেদনায়—"সিগিরাসিক" ও তেজবহল পাতা বা "ভাট্‌রাঙা" গাছ কাটিয়া প্রলেপ দেয়।

২৩। "শূকর পীড়া" অর্থাৎ গলা ও গণ্ডস্থল ফুলিয়া গেলে—শূকরের দাঁত ঘষিয়া বহির্ভাগে প্রলেপ দিয়া থাকে।

২৪। পেট ফাঁপিলে—খুব তীব্র মদ্য পানেই সারিয়া যায়।

২৫। কোষ্ঠকাঠিন্যে—কচি পেয়ারা পাতা খাইলেই বিশেষ উপকার লাভহয়।

২৬। আমাশয়ে—"দের লতি"র কচি পাতা লবণ সহযোগে খাইলে, আরোগ্য লাভ করা যায়।

২৭। পেট কামড়িতে—"আদা গুন্‌গুনি" (মণ্ডুরী)র রস অথবা সাপের পিত্ত খাইলে কমে।

২৮। প্রদর—শ্বেতবর্ণের হইলে সাদা "ভাইট" এবং রক্তবর্ণের হইলে রাঙা "ভাইট" ফুল গাছের শিকড় বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিস ও তাহার রস পান করাইলে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

২৯। সাধারণ জ্বরে—"বুলপুত্তি শাক" গরম করিয়া তাহার রস কিঞ্চিৎ লবণ সহযোগে পান করিলে অনাময় হওয়া যায়।

৩০। 'নোয়াবিছ' অর্থাৎ অবিরাম জ্বর বিশেষে—"কংমারেস", কাঁটামারিস ও "বর্জিয়াল মুদি"র রসে গণ্ডারশৃঙ্গ ঘষিয়া তাহাতে একখণ্ড বহ্নি-প্রতপ্ত লৌহ ডুবাইয়া লয়। ইহা পানে প্রায়শই আরোগ্য লাভ করা যায়।

বস্তুতঃ এ সকলের মধ্যে এমন ভাল ভাল ঔষধও আছে, যাহাদের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। দ্রব্যগুণের অদ্ভুত শক্তিতে অনেক স্থলে অস্ত্র-চিকিৎসারও প্রয়োজন হয় না, এমন কি পাথরী পর্য্যন্ত এইরূপে সারিয়া যায়। আবার কোন কোন স্থলে একরূপ অবযৌক্তিক চিকিৎসা দেখা গিয়া থাকে।

দু'একটি উদাহরণ যথা,—ফোঁড়াদি পাকিলে অরুণরাগলাঞ্ছিত উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা ফুঁড়িয়া দেয়। কাটা ঘা সত্বর না শুকাইবার হইলে, তাহাতে সলবণ কাঁচালঙ্কাবাটা বেশ পুরু করিয়া দিয়া তদুপরি এক প্রতপ্ত লৌহখণ্ড কিয়ৎকালের জন্য চাপিয়া ধরে।

ব্রতপূজাদি দ্বারা চিকিৎসা।

এই সমস্ত নিয়মাদি বিশুদ্ধ ধর্ম্মচর্য্যা নহে, রোগের করাল কবল হইতে বিমুক্তি লাভের প্রয়াস মাত্র! বিপদের প্রবল সংঘর্ষণে হৃদয় বলের পরীক্ষা হয়। মহাপুরুষেরা তাদৃশ "বিপদে ধৈর্য্য" এবং সৎসাহসকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু বলিতে কি, বিপদের অসহ্য তাড়নায় বাধ্য হইয়া অনেক গোঁড়া নাস্তিককেই দেবতাবিশেষের প্রতি ভক্তিমান হইতে এবং তথা কথিত ধর্ম্মাচরণে তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা পীড়ার শান্তি যাহাই হউক, মনের শান্তি যে নিশ্চিত লাভ ঘটে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চাক্‌মাগণ যাবতীয় রোগে বিশেষতঃ দুশ্চিকিৎস্য কিংবা বহু চিকিৎসাতেও অনাময় রোগ সমুদয়ে নানা অপদেবতার শক্তি কল্পনা করে, এবং নানা উপচারে সেই সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিরাময় হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। নমুনা-স্বরূপ এস্থলে তথাবিধ পূজার একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা :—

"হেঁ-হুঁ বাপ-মা সকল,
(অমুক) কে জ্বর দেয়—জারিদেয়।
এই তুন (১) ধরি ভাল গরিবার লাগি—
(চাউল পূর্ণ একখানি ডালায় আস্তে আস্তে ঘা দিতে দিতে)—
এক বারি (২) দেগঁর (৩) একদিনের পথখুন (৪) এজ (৫)—
দুই বারি দেগঁর দুদিনর পথখুন এজ।
তিন বারি তিন দিনর পথখুন এজ।
চের (৬) বারি দেগঁর চের দিনর পথখুন এজ।
পাঁচ বারি দেগঁর পাঁচদিনর পথখুন এজ।
ছবারি দেগঁর ছদিনর পথখুন এজ।
সাত বারি দেগঁর সাতদিনর পথখন এজ। উ—উ—উ—উ—উ (কুই)

(১) তুন—হইতে; (২) বারি—ঘা; (৩) দেগঁর—দিতেছি; (৪) পথখুন—পথ হইতে; (৫) এজ—আস; (৬) চের—চারি;

"হেঁ দেদি (১) এজ ন (২) লই ;
আগরে (৩) এজ কাক্যা (৪) লই ;
কুলৎ (৫) পোয়া কুলৎ করি আন্ ;
কোরৎ (৬) পোয়া কোরৎ করি আন্ ;
হাঁদরা পোয়া হাঁদাই আন্। উ—উ—উ—উ—উ (কুই)
"খেঁয়া দেইন (৭), মুরুং দেইন, ওক্‌চা দেইন, উ—উ—উ—উ—উ (কুই)
বাঙাল দেইন, চাক্‌মা দেইন, গির-ঘরর পুৎ দেইন—ঝি দেইন,
উ—উ—উ—উ—উ (কুই)
মুই দেগাঁর মাথাৎ করি,
তুমি লও হাতৎ করি,
এজ, দালি (৮) থই—বাপ মা সকল লোক।"

ইহা "মাটীশুকর" দিবার মন্ত্র, পূজাবিধি অনতিপরে বর্ণিত হইবে। এই একমাত্র মন্ত্রেই ইহাদের অপদেবতাসম্বন্ধের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বিজাতীয় গন্ধও তেমন নাই, ভাষাও "ঝাড়া-ফুঁ" এর মন্ত্রের ন্যায় সংস্কৃত শব্দ বিজড়িত নহে। সুতরাং এক কথায়, এই মন্ত্রগুলির উপর চাক্‌মাদিগের ন্যায় সঙ্গত দাবি রহিয়াছে।

এদাদাগানা।—শিশুসন্তান যদি কোনও অপদেবতা কর্ত্তৃক ভয় পায়, তাহা হইলে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে মাতা "সাঁকোর দুয়ারে" ভয়প্রাপ্ত সন্তানকে কোলে লইয়া বসে ; সম্মুখে "মেজাং" এর উপর একখানি থালায় একটি টাকা, একটি কলা, একটি ডিম এবং ভাত, গুড় প্রভৃতি রাখা হয়। তদুপরি একখানি বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়া পিতা একপ্রান্ত তুলিয়া ধরে। তখন লাউয়ের খোলে চাউল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিতে থাকে, "কে তোমাকে গালি দিয়াছে ? বাপে কি বলিয়াছে ? মা কি বলিয়াছে ?—আর কেহ কিছু বলিবে না,—ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। ইত্যবসরে যখন একটা মাছি বা অপর কোন কীট ঐ থালার উপর পতিত হয়, পিতা অমনি আচম্বিতে কাপড় খানি চাপিয়া ধরে ; তখন মাতা শিশুকে নিয়া দোলায় তুলিয়া রাখে। ওঝা "মেজাং" এ একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত জড়াইয়া অপর প্রান্ত ঐ দোলনায় বাঁধিয়া দেয়। অনন্তর পিতা উক্ত থালাপূর্ণ উপচাররাশি

(১) হেঁদেদি—স্রোত নিম্ন হইতে ; (২) ন—নৌকা ; (৩) আগরে—স্রোত-উর্দ্ধ হইতে ; (৪) কাক্যা—ভেলা ; (৫) কুলৎ—কোলের বা কোলে (৬) কোরৎ—কাঁকের বা কাঁকে ; (৭) দেইন—ডাইন ; (৮) দালি—ডালি।

শিশুর নিকটে লইয়া গিয়া সম্মুখে ধরে; তাহাতে শিশু টাকা কি গুড় ধরিলে ভাল নহে—তদ্ভিন্ন যদি ভাত কলা কি ডিম ধরে তাহা হইলে শুভলক্ষণ।

থ-ফেলা।—সাধারণ জ্বরাদিতে কদলী বৃক্ষাংশ, একটি পাতা, এবং চাউল একটি হাঁড়িতে সিদ্ধ করিয়া পত্রচ্ছাদিত ডালায় ঢালিয়া লয়। পরে তাহা রোগীর মাথা "নিছিয়া" দূরে নিয়া ফেলিয়া দেয়। পাছে তাহা নেওয়ার সময় "ওঝা" স্বীয় ছায়া মাড়ায়, তৎপক্ষে বিশেষ সাবধান থাকে। তাই বোধ হয়, ইহা সচরাচর বেলা তৃতীয় প্রহরে পশ্চিমদিকে নিয়া নিহিত করিবার ব্যবস্থা সাধারণ্যে প্রচলিত। এই "থ" (আপদ) ফেলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনান্তে ওঝা জিজ্ঞাসা করে, 'অমুকের অমুক ব্যারামের নিমিত্ত "থ" ফেলিয়া আসিলাম গিয়াছে ত?' বাটিস্থ সকলে এক সঙ্গে উত্তর দেয়—'গিয়াছে, গিয়াছে, গিয়াছে'।

সংবাসা পূজা।—সাংঘাতিক পীড়া বা তাদৃশ বিপদ উপস্থিত হইলে, এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে চারিটি কচু-ডগায় একখানি ক্ষুদ্র ভেলা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি সমচতুষ্কোণাকৃতিকৃত একটি পাতা দ্বারা "ছই" দেওয়া হয় এবং দুই প্রান্তে দুই খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বজাও প্রোথিত করে। অনন্তর ওঝা "ছই"য়ের নিম্নে একটি সিদ্ধ ডিম্ব এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী অন্নপিণ্ড স্থাপন করিয়া, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই সজ্জিত ভেলা নদী স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে সাত বার টানিয়া আচম্বিতে বাম হস্ত দ্বারা ডিমটি গ্রহণপূর্ব্বক ভেলাখানি স্রোতের অনুকূলে ছাড়িয়া দেয়। প্রত্যাবর্ত্তনান্তে অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, অমুকের ব্যারাম বা বিপদের নিমিত্ত যে সংবাসা পূজা করিলাম, তাহা ভাল হইয়াছে ত?' যদি পৃষ্টব্যক্তি উত্তর করে "ভাল হইয়াছে," তবেই ভাল। অনন্তর ডিমটি "ওঝা" স্বয়ং অথবা অপর কোন বালকে খাইয়া ফেলে।

মাটি-শূকর।—দুশ্চিকিৎস্যরোগবিশেষে—বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় গৃহসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ ভূমিতে চারি খানি 'বাখারি' প্রোথিত করিয়া নানাবিধ সূত্রে বেষ্টিত করে। মধ্য স্থলে একখানি ডালা চাউল পূর্ণ করিয়া রাখা হয়। অনন্তর "ওঝা" মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করে, ইহা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরে রোগী আসিয়া দণ্ডবৎ করিলে "ওঝা" "আগ-চায়," এবং একটি মোরগ শাবক ও একটি শূকর বলিদান করে। এই প্রসাদী মাংস সন্ধ্যা না হইতেই প্রতিবেশীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়।

সাঁজ-কুরা।—"মাটিশূকরে" প্রতীকার পাওয়া না গেলে সাঁজ (সন্ধ্যা) কুরা মোরগ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ কোনও প্রক্রিয়া নাই। সন্ধ্যার সময়

একটি মোরগ কাটিয়া অন্ত্রাদি ফেলিয়া দেয়, অতঃপর তাহা চালের উপর তুলিয়া রাখে। কিছুক্ষণ পরে নামাইয়া দেখে, তাহার কোনঅংশ দেবতা ভক্ষণ করিয়াছে কি না। যদি খাইয়া থাকে, তবে ভাল; নতুবা বিপদ নিশ্চিত জানিবে।

চেলা শূকর।—যে রোগ এত কঠিন বোধহয় যে, উপরিউক্ত প্রতিবিধানে অব্যাহতি লাভের আশা নাই, তন্নিমিত্ত এই "চেলা শূকর" দানের ব্যবস্থা হয়। এক ঝুড়ি পরিপূর্ণ চাউল ও খই, এবং একটি খড়ের মনুষ্যমূর্ত্তি লইয়া ওঝা রাত্রিকালে দেবতা ডাকিতে ডাকিতে নিম্নপ্রদেশাভিমুখে গমন করে। দূরবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলের বনস্পতি-মূলে তাহা স্থাপন করিয়া তথায় একটি পুংজাতীয় সুপুষ্ট শূকর বলি দিয়া থাকে। ইহার মাংস কোন ব্যক্তি খায় না। পূজা সিদ্ধ হইলে বন্য শ্বাপদের উদরসাৎ হয়; নতুবা কেহ স্পর্শও করে না, পঞ্চভূত পঞ্চভূতেই লীন হইয়া যায়। এই কার্য্যে "ওঝা" একটাকা পারিতোষিক পাইয়া থাকে।

কাল পূজা।—কোনও অপদেবতার আশ্রয়ে রোগ ধরিয়াছে সিদ্ধান্ত হইলে এই পূজা করা হয়। চট্টগ্রামের হিন্দুদিগের মধ্যেও "কালপূজার" প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু পূজাপদ্ধতি ইহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা নদীতীরেই পূজাস্থান নির্ব্বাচিত করে। মদ্যই ইহাদিগের "কালপূজার" প্রধান উপচার।

সাত-নিথিক।—সপ্তাহের কোন্ দিন কোন্ দেবতার আক্রমণে ব্যারাম হয়, সেই সেই দেবতার পূজাবিধিই বা কি,—ইত্যাদি সংক্রান্ত এক বিবরণী পুস্তিকা প্রায় প্রত্যেক "ওঝার" নিকটে আছে। তদনুসারেই এই নিথিং পূজা চলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া চান্দ্রনিথিকও আছে, তাহাতে কোন্ তিথিতে কোন্ দেবতার আক্রমণে পীড়া হয় এবং তাঁহাদের পূজা প্রক্রিয়া—বর্ণিত আছে।

খানমানা।—ইহার অন্য নাম "খাং-পূজা।" "খাং" অর্থ চাঁদা; প্রতিবেশী সকলের সম্মিলিত চাঁদায় অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহা "খাংপূজা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নদীতীরে পূজার স্থান এবং শনি বা মঙ্গলবারে পূজার দিন নির্ব্বাচিত হয়। পূজার নিমিত্ত প্রতিবেশী প্রত্যেক পরিবার হইতে কিছু কিছু চাউল, খই এবং এক এক চুঙা মদ্য আসে, এতদতিরিক্ত "ওঝা"ও দুই চুঙা মদ্য পাইয়া থাকে। যথাবিধি পূজা শেষ হইলে "আগ্ চাওয়ার" পর সকলে সন্তুলোদক অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রণিপাত করে। অনন্তর বলিদান করা হয়। ইহা একটি বিরাট ব্যাপার! একত্রে এতগুলি প্রাণীবধ ইহাদিগের আর কোন অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। একুনে—পাঁঠা দুইটি, শূকর দুইটি, পারাবত এক যোড়া এবং প্রত্যেক পরিবারের সঙ্কল্পে এক একটি মোরগপ্রাণ সমর্পিত হয়। চাঁদায়

পরিমাণ বেশী হইলে এই সঙ্গে মহিষ বলিও প্রদান করা হয়। বলির পরে "ওঝা" নৈবেদ্য হইতে আচম্বিতে কিছু চাউল গ্রহণ করিয়া পুনরায় পরীক্ষা দেখে। অযুগ্ম সংখ্যায় শুভ এবং যুগ্ম সংখ্যায় অশুভ সূচিত হয়। শেষোক্ত স্থলে পুনঃ পুনঃ তিনবার পর্য্যন্ত পরীক্ষা দেখিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থই ভাত, অপরাপর ব্যঞ্জন এবং সামান্য লবণ মসলাদি সঙ্গে আনে। এখানে মাংসমাত্র পাক করিয়া আমোদ আহ্লাদে ভোজন করে।

এই পূজা সিদ্ধ হইলে "আদমের" যাবতীয় অমঙ্গল বিদূরিত হয়। বিশেষতঃ মারীভয়ার্ত্ত গ্রামবাসীর আসন্নবিপদ মুক্তির ইহাই অমোঘ উপায়। ভিন্ন গ্রামে ওলাউঠা বা বসন্তাদি দেখা দিয়াছে—শুনা গেলে, ইহারা যথাসম্ভব সত্বরে "থানমানা" পূজা অনুষ্ঠানে তৎপর হয়। এতদ্ভিন্ন যাহাতে তাহাদের গ্রামে সেই দূষিত রোগের বীজ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কয়েকদিনের নিমিত্ত ইহারা "পাড়াবন" অর্থাৎ পাড়া বন্ধ করে। পূর্ব্বে সচরাচর সাতদিনের জন্য করা হইত, সাধারণের অসুবিধা ঘটে বলিয়া অধুনা ঊর্দ্ধ সংখ্যায় তিন দিন, প্রায়শঃ একদিনের নিমিত্তই করা হয়। কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট দিনে আদমে কাহারও প্রবেশাধিকার থাকে না এবং সেই পাড়ার লোকেরাও বাহির হইতে পারে না। কাহাকেও বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে যাইতে হইলে সেই দিনই পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু আদমের বহির্ভাগে থাকিতেই পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রক্ষালিত করিয়া, তবে প্রবেশ করে। আদমের চতুর্দ্দিকে পতাকা এবং "বানর (১) ঝুলাইয়া" দিয়া 'প্রবেশ নিষেধ' আজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করা হয়। ইহা ছাড়া তাহারা এই কয়দিন পবিত্রভাবে পূজার্চ্চনা সহকারে কাল কাটাইয়া থাকে।

পাড়া বন্ (বন্ধ)।

এইরূপে দূষিত ও সংক্রামক পীড়ায় ইহাদের সতর্কতা অসাধারণ। পরিবারে কাহারও কুষ্ঠব্যাধি হইলে বাড়ীর অনতিদূরে পৃথক ঘর করিয়া তাহাকে রাখে এবং নির্দ্দিষ্ট একজন গিয়া যথা আবশ্যক সাহায্য করে। ইহা দ্বারা রোগীকে যে ঘৃণা করা হয়—তাহা নহে; যেন তৎসংসর্গে অপরকেও ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য সাবধান থাকে মাত্র।

চাকমাদিগের মধ্যে চর্ম্মরোগ অতিশয় সাধারণ। বলা বাহুল্য, পরিষ্কার

(১) "বানর"—বিতস্ত্যেক পরিমিত বংশখণ্ডমাত্র। "হোয়াইজেন্টেলবার"-আকারে বাঁশ পুতিয়া তাহাতে ইহা ঝুলাইয়া দিলেই, লোকে—"বানর ঝুলাইয়াছে" বলিয়া 'প্রবেশ নিষেধ' বুঝিতে পারে।

পরিচ্ছন্নতার অভাবই তাহার কারণ। গ্রীষ্মকালে কর্ম্মসমাপনান্তে "গা-ধুইবার" নিয়ম আছে বটে, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র প্রায়ই প্রবর্ত্তিত হয় না। শীতকালে স্নানের নাম করিলেও ভয়ে অনেকের শরীর শিহরিয়া উঠে! সম্প্রতি উপদংশেরও বিস্তর প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যেই এই রোগের আক্রমণ অধিক। দুই পুরুষ অর্থাৎ শতেক বৎসর পূর্ব্বে এই পীড়ার অস্তিত্বও চাকমাসম্প্রদায়ে অজ্ঞাত ছিল। অধুনা আরও দুইটি রোগ বিশেষ পশার লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে একটির নাম—"চানাপীড়া"। ইহা প্রথমে সামান্য পালাজ্বররূপে দেখা দেয়, ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবিরাম ভাব ধারণ করে। জিহ্বা ও কণ্ঠনালিতে দূষিত ক্ষত হয় এবং পরিশেষে প্রলাপাদি উপসর্গ আসিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করে। অপরটি—"নোয়াবিছ্" অর্থাৎ নূতন বিষ। ইহা প্রবল অবিরাম জ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই রোগদ্বয় উপদংশেরও পরবর্ত্তী কালে ইহাদের ভিতর আমদানী হইয়াছে।

বিশেষ রোগ।

এতদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়া, দূষিত জলবায়ু, উপযুক্ত খাদ্যাভাব, কৃমি, বাতব্যাধি, উদরাময় প্রভৃতিও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পঁচা মাছ মাংস ও অত্যধিক লঙ্কা ভক্ষণ, এবং পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার ত্রুটিতেই এই সমুদয় রোগ জন্মিয়া থাকে।

১৯০১ ইংরাজীর আদম সুমারিতে দেখা যায়, এই পার্ব্বত্য প্রদেশে,—

উন্মত্ত			কালা-বোবা			খঞ্জ			কুষ্ঠ গ্রস্ত।		
মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
১৫৮	৮২	৭৬	৮০	৪৩	৩৭	১৩৭	৮২	৫৫	৬২	৫০	১২

মোট ২৫৭ জন পুরুষ এবং ১৮০ জন স্ত্রীলোক রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ। বাঙ্গালার অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে উন্মাদের সংখ্যা বেশী; অতিরিক্ত মদ্যসেবনই ইহার প্রধান কারণ হইবে। কেননা যে সকল দেশে মাদক দ্রব্যের প্রচলন অধিক, তৎসর্ব্বত্রই বিকৃত মস্তিষ্কের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখান যায়—ইংলণ্ডে বঙ্গদেশ অপেক্ষা পাগলের সংখ্যা শতকরা ১৩ অধিক। বোধহয় আর খুলিয়া লিখিতে হইবে না যে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সমুদয় অধিবাসীদের অনুপাতে অংশতঃ চাকমাদিগের অবস্থা অনায়াসে অনুমান করিয়া লওয়া সহজসাধ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

[১] পোষাক পরিচ্ছদ—গহনা,

এবং

[২] অন্যান্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম।

[১]

পোষাক পরিচ্ছদ জাতিবিশেষের প্রধান বহিঃনিদর্শন। বাসস্থানের শীতাতপভেদে নির্দ্ধারিত হইলেও এই বহিরাবরণ মাত্র দর্শনে জাতীয় পরিচয় দান্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার প্রবল প্রবাহে সে সুবিধা নষ্ট হইয়া যাইতেছে; উদার-অনুকরণের আঘাতে জাতীয় বিশেষত্ব সমুদয় বিলুপ্ত প্রায়! অন্যে পরে কা' কথা, অধুনা পিতামাতা প্রবাসাগত পুত্রকে চিনিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; প্রণয়িণী—জীবনার্দ্ধভাগিনী বিদেশাগত প্রাণপতিকে হঠাৎ কক্ষদ্বারে উপনীত দেখিয়া সতীত্বের মর্য্যাদা-রক্ষাভয়ে আকুলপ্রাণে পলায়ন করিতেছেন; প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণ আগন্তুককে দেখিয়া অপরিচিত জ্ঞানে দূরে দাঁড়াইয়া আছে; বর্ত্তমানে এইরূপ ঘটনা আরব্য কি পারস্য উপন্যাসের অভিনয় বা "গুলিখোরী গল্প" মাত্র নহে। নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, এই 'ইঙ্গবঙ্গের' দলে হিন্দুদিগের সংখ্যাই অধিক; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত চাকমা সম্প্রদায়েরও দু'চারিজন এই সজ্জা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনুকরণ অবশ্য নিন্দনীয় নহে। তবে তাল ছাড়িয়া মন্ত্রের অনুবর্ত্তী হওয়া কখনই ক্ষমার্হ নয়। এদেশে গরমে প্রাণ আইঢাই করে; গায়ে চাদরখানি রাখাও অসহ্য হইয়া উঠে; তাদৃশী অবস্থায়—গঞ্জি, সার্ট, ওয়েষ্ট্‌কোট্, ওপেন্‌কোট ইত্যাদি ইত্যাদি শীতপ্রধান দেশোপযোগী হিমনির্য্যাতক পোষাকসমূহ আঁটিয়া নিরন্তর "পাখা" "পাখা" করিবার আবশ্যকতা

উদার-অনুকরণ।

কি, বুঝিতে পারি না (১)। এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কতিপয় জাতীয়-হিতৈষী হুজুগ তুলিয়াছিলেন, 'চাদর উঠাইয়া দেওয়া হউক'; কিন্তু হায় হতভাগ্য হিন্দুসমাজ! যদি পিতৃ-পিতামহাচরিত গাত্রাবরণের সেই একমাত্র নিদর্শন উত্তরীয় বস্ত্রখানিই বিসর্জ্জন করিবে, তবে আর রাখিলে কি? যাউক আর অধিক বকিয়া ফল কি, ইহা হইতেই যদি অশুচিকীর্ষু ভ্রাতৃবৃন্দের পূর্ব্বে একবার ভালমন্দ বিবেচনা করিবার জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এক্ষণে আমরা আলোচ্য বিষয়ের পুনরবতারণা করি।

(পুরুষদিগের) পোষাক-পরিচ্ছদ।

চাক্‌মা সম্প্রদায়ের পুরুষদিগের পোষাক সাধারণ হিন্দুগণের ন্যায়, দেখিতে 'বড়ুয়া' অর্থাৎ বাঙ্গালী মঘ বলিয়াই মনে হয়। প্রৌঢ়সমাজ মস্তকে "খবং" বাঁধিয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত আছে; প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী "কাটুয়া কল্যার আমলে"ও "খবং" এর গৌরব-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পাগড়িকে মঘেরা "গম্বং" বলে, তাহা হইতেই "খবং" শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তদ্বারা মনে হয়, ইহারা মঘদিগের হইতেই পাগড়ির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে; কিন্তু পুরাকালে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়েই পাগড়ির সবিশেষ প্রচলন ছিল (২)। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নহে। ইহা ছাড়া শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে সার্ট, কোটের ব্যবহার প্রচুর। বর্ত্তমানে সেই পুরাকালের "ছিলুম্" (আঙ্‌রাখা) নিঃস্ব গরীব দুঃখীর মাত্র সম্বল হইয়াছে। তাদৃশী হীনাবস্থায় না পড়িলে "গামছাখানি"ও কেহ পরিধান করিতে চাহে না। তবে দরিদ্রগণ সচরাচর "লেংটি" মাত্র পরিয়াই জীবনাতিপাত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত চাক্‌মাগণ শিকারে কিম্বা দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে "কর্জ্জাল"-(থলিবিশেষ) মধ্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পূর্ণ করিয়া স্কন্ধোপরি ঝুলাইয়া লয় এবং কোমরে "পানর খল্যা" (থলি) রাখে। তন্মধ্যে আবার পান বাঁধিয়া রাখিবার নিমিত্ত একখানি

(১) এদেশপ্রবাসী জনৈক ইউরোপীয় লেখকই বলিয়াছেন,—"We, in England, wear many articles of clothing, simply because life could not be preserved in that climate without them; but here any large amount of clothing is absolutely insupportable. True modesty lies in the entire absence of thought upon the subject.

(২) মাণিকচাঁদের গানেও দেখা যায়,—"কার মত পাগড়ি রাখিছ মস্তক উপর।"

"পানরপানি"ও থাকে। পরন্তু এই "কর্জ্জাল", "পানর খল্যা" এবং "তাগল" (দা) ইহাদের পথ-পর্য্যটনের বিশেষ সজ্জা। এস্থলে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, কোন কোন চাক্‌মা যুবককে রৌপ্যবলয় ব্যবহার করিতেও দেখা যায়।

রমণী সমাজে এযাবৎ জাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ যথেষ্ট প্রচলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদেরও অনেকে অধুনা অনুকরণোৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছে।

(স্ত্রীলোকদিগের) পোষাক-পরিচ্ছদ।

বিশেষতঃ রাজা ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবারের মহিলাগণ সচরাচর সাড়ীই পরিধান করিয়া থাকেন; এবং 'জ্যাকেট্' 'বডি' প্রভৃতি অবস্থাপন্ন পরিবার-মাত্রেই প্রায় সাধারণ। এইসঙ্গে অনেক বাড়ীতে কুন্তলীন, কেশরঞ্জন প্রভৃতি গন্ধতৈল, এসেন্স্ এবং সুবাসিত সাবানও ক্রমধিক পরিমাণে আমদানী হয়। বিলাসিতার খরস্রোতে একে একে সমুদয়কে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে আমরা ইহাদিগের প্রকৃত জাতীয় পরিচ্ছদ খুঁজিয়া লই। পরিধেয় বস্ত্রের আখ্যা "পিঁধন"। ইহার বর্ণ নীল, মধ্যে প্রায় চারি অঙ্গুলী বিস্তৃত লোহিত বর্ণের দুইটি সুদীর্ঘ ডোরা (১) থাকে। দৈর্ঘ্যে দেড় মোর দিবার মত, তিন হাত পরিমিত হইবে। পরন্তু উহা পড়িবার এমনি বাহাদুরী যে, ইহারা লজ্জাশীলতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াই লোক সাধারণের সমক্ষেও প্রস্রাবাদির নিমিত্ত বসিয়া যাইতে পারে। কাপড়ও এত মোটা, তাহার মধ্যদিয়া সূর্য্যরশ্মিও প্রবেশলাভ করিতে সুবিধা পায় না। এক একখানি "পিঁধন" ওজনে বোধ হয় ৭।৮ সের হইবে। এক জোড়ায় একজনের প্রায় দুই বৎসরাধিককাল অবাধে চলিয়া যায়। যৌবনোন্মুখিনী হইতেই রমণীগণ "খাদী" দ্বারা বুক বাঁধিতে আরম্ভ করে। বক্ষোবন্ধনকে ইহারা এত আবশ্যকীয় মনে করে যে, জ্যাকেট্, বডি পরিয়াও তদুপরি "খাদী" বাঁধিয়া থাকে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ পিঁধনের পরিবর্ত্তে যে সাড়ীর ব্যবহার করেন, তৎপ্রান্তভাগ দিয়াই সচরাচর তাঁহাদের বক্ষোবন্ধন চলে। খাদী দ্বিবিধ,—"রাঙাখাদী" ও "ফুলখাদী।" সাধারণতঃ রাঙাখাদী যুবতীগণ এবং ফুলখাদী প্রাচীনারা ব্যবহার করে। "ছিলুম" অর্থাৎ কোর্ত্তাও ইহাদের মধ্যে কম প্রচলিত নহে। বিশেষতঃ বিবাহকালে "ফুলছিলুম" না হইলেই নয়। এতদ্ব্যতীত

(১) টংচঙ্গীয়া রমণীর পরিধেয় বস্ত্রও প্রায় এই অনুরূপ; কেবল লোহিত ডোরার একটি, প্রায় এক ফুট বিস্তৃত হইয়া পাইয়ের অধিকার পায়।

মস্তকে "খবং" বন্ধন প্রত্যেক মহিলারই একান্ত কর্ত্তব্য। সচরাচর সকলে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালে "খবং" বাঁধিয়া উঠে, এবং স্নানের সময় পর্য্যন্ত তাহা সযত্নে রক্ষা করে। কিন্তু পূজা, বিবাহ বা অপরাপর উৎসবের সময় ইহারা অহর্নিশ মাথায় "খবং" রাখিতে বাধ্য হয়। অধুনা সম্ভ্রান্তা রমণীগণ শাড়ীর অঞ্চলভাগ মাথায় দিয়াই "খবং এর বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। "খবং" মাথায় থাকিলেও ইহারা জনসমাগম স্থানে গমনকালে, তদুপরি শুভ্র বা লোহিতবর্ণের 'ওড়না' ঢাকা দিয়া যায়; তাহাই ইহাদিগের অবগুণ্ঠন। এই 'ফেসন' যে স্পেনীয় মহিলাগণের মধ্যেও দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। বিগত ১৩১১ সনের "মহামুনি মেলায়" দেখা গেল, "কুরাকুট্টা" গোছার পুরাঙ্গনাগণ লোহিতবস্ত্র-মস্তকেই আসিয়াছিল। পরন্তু শ্রেণীবিশেষে পরিচ্ছদের তাদৃশ কোন তারতম্য আছে বলিয়া শুনা যায় না।

এই বনবাসিনীগণ বনফুলে সাজিতেই অধিকতর ভালবাসে। রাজকন্যা ও রাজপুত্রবধূ সীতাদেবী স্বীয় বনবাস কালের বর্ণনায় একদা কবির ভাষাতে বলিয়াছিলেন:—"তুলি কুবলয়ে (অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে; সাজিতাম ফুলসাজে; হাসিতেন প্রভু, বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!" বস্তুতঃ

গহনা।

ফুলসাজে এই ফুলরাণীগণকে দেখিলে স্বর্গীয়া অপ্সরা বলিয়াই ভ্রম হয়! রজতকাঞ্চনের বিবিধ ভূষণাবলী প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সজ্জার তুলনায় কত যে তুচ্ছ, ইহাদিগকে দেখিয়াই তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়। হায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে সোণারূপার কৃত্রিম আভরণ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে! সম্ভবতঃ তাহা নশ্বর প্রাকৃতিক ভূষণ ব্যবহারের অসুবিধা নিবন্ধনই অন্যান্য জাতির অনুকরণে বাধ্য হইয়াছে। নিম্নে অলঙ্কারসমূহের একখানি তালিকা দেওয়া হইতেছে। তন্মধ্যে যে সকল গহনা চট্টগ্রাম ও বঙ্গের অপরাপর স্থানে ব্যবহৃত আছে, তৎসমুদয়ের পার্শ্বে তারা চিহ্ন স্থাপিত হইল; সুতরাং তদ্দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণ ইহাদিগের নিজস্ব অলঙ্কার সহজেই বাছিয়া লইতে পারিবেন। খোপায়—চোরি; কানে—(নিম্নভাগে) কর্ণফুল*, রাজবোড়, ঝিরমিলি* এবং নাদেং; এই শেষোক্ত শব্দটি খাস মঘী। মঘদিগের মধ্যেও এই গহনাখানি প্রচলিত আছে; তবে আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। উহাদের "নাদেঙের" পরিধি প্রায় তিন ইঞ্চি হইবে। পাহাড়ী মহিলাদিগের কর্ণলতিকারন্ধ্র সাতিশয় বিস্তৃত। পূর্ব্বে যে "ছাক্" জাতির আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাদের রমণীগণের কানের ছিদ্র এত বড় করা হয়

যে, বাঁশ ভিন্ন অপর কিছুতেই উহা রক্ষা করিবার সুবিধা নাই; কর্ণপ্রান্ত আসিয়া প্রায় স্কন্ধদেশ চুম্বন করে। চাকমামহিলার কর্ণলম্বিকারন্ধ্র তাদৃশ বড় নহে। কেবলমাত্র "রাজযোড়" পরিধানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বৃহত্তর ছিদ্রের প্রয়োজন; তৎপরিধি কোনরূপে একইঞ্চিমাত্র হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহাদিগের প্রত্যেক কর্ণে চারি-পাঁচটি ছিদ্র করা হয়। তৎসমুদয়ে "ঝম্বলি" পরিধান করিয়া থাকে। নাকে—সোনানগ*, গলায়—হাঁচুলি*, চন্দ্রহার*, মটরদানা*, (সাধারণ পরিবারে) "টাকার ছড়া" এবং (নিতান্ত গরীবদুঃখিনীরা—বিশেষতঃ কুমারীগণ) পুঁতিরলহরী মাত্র পরিয়া থাকে। বাহুতে—তাড়যোড়*; নীচের হাতে—কুচী*, বাহু*, কঙ্কণ*, এবং রসিকবালা* প্রভৃতি নানারকমের বালা আছে। অধুনা নব্যসমাজে নানাবিধ সুরঙ্গিন কাচও পরিগৃহীত হইতেছে। আঙুলে—আঙটি* খুবই সাধারণ। পায়ে—নিটোল "চরণমল"*, ইহার পরিধি তত অধিক থাকে না; যথাসম্ভব ছোটথাটো করা হয়, যেন কোনরূপে পায়ে জড়াইয়া থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সমুদয় গহনার অধিকাংশই রৌপ্য নির্ম্মিত। কেবল "সোনানগ" এবং কোন কোন স্থলে "ঝম্বলি"গুলিমাত্র সোনায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে এক্ষণে কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্বর্ণালঙ্কারের পশার বাড়িতেছে; এবং প্রাচীন-প্রথার গহনাগুলিও ক্রমশঃ নির্ব্বাসিত হইতেছে। কিন্তু সাধারণ পরিবারে রাজা বা তৎক্ষমতালব্ধ দেওয়ানের অনুজ্ঞাব্যতিরেকে কেহ বাহু, চন্দ্রহার, চরণমলপ্রভৃতি রৌপ্যালঙ্কার পরিধানেও সক্ষম নহে, প্রত্যুত স্বর্ণাভরণের ব্যবহার ত তাহাদিগের পক্ষে কদাপি অনুমোদিত হইতে পারে না। পূর্ব্বে ইহাও বলিয়া আসিয়াছি, ইহারা স্বামীর মৃত্যুতে অন্ততঃ সাতদিনের নিমিত্ত যাবতীয় অলঙ্কার বর্জ্জন করে; পরে অন্যান্য গহনা ধারণ করিলেও পুনর্ব্বিবাহিতা না হওয়া পর্য্যন্ত "হাঁচুলী" গলায় দিতে পারে না। বৃদ্ধা বিধবাগণ অলঙ্কারমাত্রই ধারণে বিমুখ হয় এবং কেহ কেহ হিন্দুবিধবার অনুকরণে খোলের কাপড় পরিধানে বিরহবিধুর জীবন কাটাইয়া থাকে।

[২]

সাজসরঞ্জামের মধ্যে সম্পন্ন মহাশয়দিগের বাড়ীতে প্রায় কোনও দ্রব্যের অভাব দেখা যায় না। এমন কি, আমাদের দেশের সাধারণ জমীদার-গৃহেও তাদৃশ সাজ-সরঞ্জাম সকলের থাকে না। তাঁহাদের গৃহের আসবাবাদি বেশ

আসবাব।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক সভ্যতানুমোদিত।

সুতরাং তৎসমুদয়ের অনাবশ্যক বিবরণী দিয়া বক্তব্য

প্রসঙ্গের নিরর্থক কলেবর বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন মনে করি না। কেবল নিঃস্ব-প্রায় সাধারণ পরিবারের চিত্রখানি এস্থলে অঙ্কিত করিয়াই এবিষয়ে ক্ষান্ত হইব। অমিতব্যয়িতারূপ রাহুগ্রাসে ইহাদের সুখশশী নিরন্তর কবলিত হইতেছে। তাহারই ফলে এবং উত্তমর্ণদিগের কৃপায় ইহারা দিন দিন দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া যাইতেছে। অনেককেই কদলপত্রে ভোজন এবং লাউয়ের খোলে জলপানে কোনরূপে হতভাগ্য জীবন অতিবাহিত করিতে হয়! হয়তঃ ঘরে কাঁথাখানি পর্য্যন্ত নাই, অথচ তাহাদের উৎপাদিত তুলায় লেপ প্রস্তুত করিয়া কত লোকে শীত নিবারণ করিতেছে। যখন পার্ব্বত্য প্রদেশের নিদারুণ শীতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় করিয়া তোলে, জীর্ণ-দীর্ণ বস্ত্রখণ্ড মাত্র তাহাদের সেই দুঃসময়ের সম্বল হয়। এবং গৃহমঞ্চের মধ্যভাগে যে অগ্নি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে, হিম-নির্য্যাতন তাদৃশ অসহ্য হইলে পরিবারের সকলে তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া গোষ্টিসুখ উপভোগ করে। এবং সেই সময়ে প্রিয়তমার অনলদীপ্তি-প্রদীপ্ত মুখচন্দ্রখানি দেখিতে দেখিতে—পাহাড়ী যুবক অপার আনন্দে অধীর রহে। ফলতঃ ইহাই তাহাদের শান্তি—ইহাই তাহাদিগের সুখ। হায়! এসমুদয় দরিদ্র পরিবারে রাত্রিতে তৈল জ্বালাইবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নাই; 'বাখারী'র মশাল মাত্র অনন্ত ভরসা। তাহাদের সাধারণ কার্য্য গৃহমধ্যে রক্ষিত অগ্নির প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নিম্নে সাধারণ গৃহস্থেরই নিতান্ত আবশ্যক কতিপয় সামগ্রীর উল্লেখ করা গেল :—

"তাগল"—অর্থাৎ দা। ইহা সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ত্তনাস্ত্র। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় আঠার ইঞ্চি হইবে। অগ্রভাগ প্রশস্ত, ধার একপার্শ্বে—বাটালির ন্যায়। বাঁট সচরাচর গাছ কিংবা বংশখণ্ড ড়িরই দেওয়া হয়; তবে শেষোক্ত ব্যবস্থাই প্রকৃষ্টতর। ওজন—ব্যবহর্ত্তার শক্তি-অনুযায়ী; অবলা এবং বালকদিগের "তাগল" অবশ্য হাল্কা করা হয়। তরি-তরকারী সংগ্রহে, গৃহাদি নির্ম্মাণে এবং জুমের কার্য্যে "তাগলের" নিত্য ব্যবহার। খন্তা, কুড়ুল, কোদালী, বাইস প্রভৃতির কার্য্য, ইহারা এই একমাত্র "তাগল" দ্বারা নির্ব্বাহ করে। এমন কি, পূর্ব্বে তৎসমুদায় অস্ত্রের নামগন্ধও ইহারা জানিত কিনা সন্দেহ। অধুনা অবশ্য কর্ম্মসৌকর্য্যার্থে অনেকেই "মাড়ি কোড়নী" (খন্তা), "বাইচ্" (বাইস) প্রভৃতি দু'একখানি গ্রহণ করিয়াছে। পথপর্য্যটনেও "তাগল" ইহাদিগের প্রধান সহায়। এতদ্বারা তাহারা একদিকে যেমন এই পর্ব্বতাকীর্ণ দেশে পথভ্রম ঘটিলে জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা করিয়া লয়, অপর দিকে তেমনি বন্যজন্তুর করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া

থাকে। বিশেষতঃ এই পার্ব্বত্য পথের পার্শ্বে অজগর সাপ প্রায়ই বিচরণ করে। তাহারা সুবিধা পাইলে পথিকের পদবেষ্টনপূর্ব্বক বিষম অনর্থ ঘটায়। সুতরাং সে সময় দা সঙ্গে থাকিলে পদবেষ্টিত সর্পের মাথাটী কাটিয়া ফেলিয়া যেনরূপে রক্ষা লাভ হয়। এককথায় এই অস্ত্রব্যতীত ইহাদিগের জীবন যাপন একরূপ অসম্ভব। সাধারণ প্রত্যেকেরই সঙ্গে তাহাদের স্বস্ব "তাগল" থাকিতে দেখা যায়। ইহা হয়তঃ হাতেই থাকে, অন্যথা নিতম্বের দক্ষিণপার্শ্বে—পরিধেয়ান্তরালে গুঁজিয়া রাখে। ইহার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ সাবধানতার প্রয়োজন, নতুবা কর্ত্তক নিজেই আহত হয়। সচরাচর দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বাম পদের দিকে এবং প্রত্যানয়নে ঠিক বিপরীতাভিমুখে আঘাত করা হইয়া থাকে। পুরাকালীন যুদ্ধাস্ত্রগুলি এই 'দা' বিশেষমাত্র। তবে কিনা সেগুলি অতিশয় লম্বা ও ভারী। মালয় দেশীয় "পৈরংলটক" এর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। সেকালে তৎসমুদায় যুদ্ধাস্ত্র কোষনিবদ্ধ করিয়া কটিদেশে ঝুলাইয়া লওয়া হইত। ইহাছাড়া জুমের শস্য বপন করিতে—"চুচ্যাং তাগল" ব্যবহৃত হয়। ইহার অগ্রভাগ "চুচ্যাং" অর্থাৎ সূঁচালো। শস্য বুনিবার সময় ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করা হয়। তদ্ভিন্ন এদেশে অনেকে এমন এক রকমের কুড়ুল ব্যবহার করে, তাহার লৌহাংশ খুলিয়া ফিরাইয়া লইলে বাইসের কাজ চলে। "চারি"—কাস্তেবিশেষ। কিন্তু ইহার গঠনে বিশেষত্ব আছে। লম্বে তাদৃশ অধিক নহে এবং তত বক্রও নয়। কারণ লম্বা কাস্তে দিয়া জুমক্ষেত্রে সুবিধা হয়না। তাহাতে এক শস্যের গাছ ছেদনকালে অপর শস্যের গাছও কাটাযাইবার আশঙ্কা আছে। বলা বাহুল্য, ধান্যাদি গাছ কর্ত্তনের নিমিত্তই এই "চারি" ব্যবহৃত হয়। ইহা দেখিতে ঠিক 'কাটারী'র ন্যায়; ধারে কাস্তের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা কাটা আছে।

"দুল"—(ডোল), "বারাং" "দিংরা" প্রভৃতি বংশনির্ম্মিত ধান্যাদি রক্ষণাধার। বৃহত্তর "বারাং"কেই "দিংরা" কহে। "কাল্লোয়াং"ও বংশনির্ম্মিত ঝুড়ি বটে, ইহা ধান কাটিতে, তরি-তরকারী সংগ্রহ করিতে, কাষ্ঠাদি বহন করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু এই সমুদয়েরই সাধারণ আখ্যা—"থুরুং"। এতদ্ভিন্ন বংশনির্ম্মিত আরও কয়েক রকমের ঝুড়ি আছে; তৎসমুদয় বিভিন্ন কার্য্যে আবশ্যক হয়। যথা—"পুল্যাং" করিয়া জল সিঁচে, "কুরুং" বীজশস্যলইবার এবং তিল তুলিবার সময় প্রয়োজনে আসে। "ফুল বারাং" এর মধ্যে পোষাকী কাপড়, গহনা পত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্যাদি রক্ষা করা হয়। তা'ছাড়া কার্পাস রাখিবার নিমিত্ত

"কালি"; শস্যাদি শুকাইতে "ছাবরা", তলই ; মাছ ধরিতে "লুই", "ঝোঙা", "জে-চেই", "ভুম্বু-চেই", "রাম-চেই" "আং-চেই" "ডুব" শস্যাদি ঝাড়িতে চালিতে একমাত্র "চালনই" ; ঔষধাদি রাখিবার "ছাম্মোয়া", ভাত খাইবার "মেজাং" ইত্যাদি ইত্যাদি ছোটখাটো নানাবিধ জিনিষ থাকে। এসমুদয়ের মূল্যও অবশ্য বেশী নহে, প্রায় সকলেই নিজেরা তৈয়ার করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত মাছ রাখিবার "ডুলা", শস্যাদি মাপিবার "আড়ি" "সেরা" এবং ছেলে দোলাইবার "ধুলন" প্রভৃতি কতিপয় জিনিষ মাত্র বেতদিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"ডাবা" ইহাদিগের পরিবারে নিত্য প্রয়োজনীয়। ইতিপূর্ব্বে তামাকের ব্যবহার প্রাচুর্য্যের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই ইহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সম্পন্ন পরিবারে নারিকেলের খোল এবং কেহ কেহ বা "মাট্যা (মৃণ্ময়) হুক্কা" ব্যবহার করে। নতুবা বাঁশের ডাবাই সর্ব্বসাধারণ। পথপর্য্যটন কি জুমক্ষেত্রের নিমিত্ত বংশ হুঁকাই প্রায়শ প্রচলিত দেখা যায়। ইহা এক পাক বাঁশ মাত্র, মধ্যে কল্কে বসাইবার জন্য একটি নল বসান থাকে। ঊর্দ্ধ প্রান্ত খোলা। মুখমধ্যে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিয়া বা হস্তদ্বারা বিস্তৃতপথ সঙ্কুচিত করিয়া তাহাতে মুখ প্রদানে মনের সাধে ধূম পান করিতে থাকে। প্রতি পরিবারে এইরূপ ডাবা (মঘকথায়—চিবিদং) অন্যূন ২। ৩টা দেখা যায়।

চড়্‌কা, চড়্‌কী ও ধনু।—কার্পাসের বীজ ছাড়াইতে "চড়্‌কী", ধুনিবার নিমিত্ত "ধনু" এবং সূতা কাটিবার জন্য "চড়্‌কা"ও ইহাদের অনেকের ঘরে থাকে।

সাধারণ পরিবারে মৃণ্ময়পাত্রেই প্রায় যাবতীয় ব্যবহার চলে। কিন্তু মৃণ্ময় ভাণ্ডও এদেশে সাতিশয় দুর্ম্মূল্য! কারণ এখানে কুম্ভকার নাই, তদ্ব্যবসায়ের প্রতিও এযাবৎ কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বে ইহারা এই মৃত্তিকাপাত্রের ব্যবহারও জানিত না, বাঁশের "চুঙার" করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিত (১)। অপরাপর জাতির অনুকরণেই অবশেষে তাহাদের মধ্যে "হাঁড়ী", "পাতিল", "তেলইন", "ঘড়া" (কলসী) ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে যে সকল মৃত্তিকার জিনিষ এখানে আমদানী হয়, পথে তৎসমুদয়ের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ব্যবসায়ীরা অবশিষ্টগুলি অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। পরন্তু মূল্য যাহাই হউক, হুক্কা, কল্কি এবং হাঁড়ীপাতিলাদি নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীগুলি

(১) এখনো অনেক পরিবারে কোন কোন ব্যঞ্জন (অবশ্য সখ করিয়া) "চুঙা"র পাক করিয়া খায়, তাহাতে নাকি ব্যঞ্জনের আস্বাদ বাড়ে।

প্রত্যেক সংসারে অবশ্যই থাকে। অবস্থাভেদে কাঁসা-পিত্তলের বাসনাদিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তের উল্লেখ আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে গাছের অভাব নাই। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে আস্‌বাবাদিতে কাষ্ঠের ব্যবহার এত কম যে, ভাবিলে অতিশয় দুঃখ হয়। সাধারণতঃ ঢেঁকি, মঞ্চের "সাঁকো" এবং মহিষের গলার "ঘন্টি" প্রভৃতি দু'চারিটি জিনিষ মাত্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হয়। শিল্পজ্ঞানের অভাবই ইহার বিশিষ্ট কারণ হইবে! তবে বর্ত্তমানে অবস্থাপন্ন পরিবারে বিদেশীয় সাজসরঞ্জামাদি তাদৃশ বিরল নহে। নিতান্ত দরিদ্র না হইলে—'আলমারী' থাকুক আর নাই থাকুক, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি অবশ্যই আছে। তদ্ভিন্ন লাঙ্গলের চাষ প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি সাধারণ পরিবারেও কাষ্ঠের কতিপয় সরঞ্জাম বাড়িয়াছে। যথাসময়ে উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি যে, ইহাদিগের মধ্যে বাঁশের আরও একটি আসবাব আছে, তাহা বস্ত্রাদি রাখিবার 'আল্‌না' বিশেষ; নাম "সারবাঁশ"। ইহা সচরাচর "গুদী"র মধ্যেই থাকে।